Dorjar Opashe by Humayun Ahmed

হুমায়ূন আহমেদ
দরজার ওপাশে

প্রস্তাবনা

তার ডাক নাম হিমু। ভাল নাম হিমালয়। বাবা আগ্রহ করে হিমালয় নাম রেখেছিলেন, যেন বড় হয়ে সে হিমালয়ের মত হয় — বিশাল ও বিস্তৃত, কিন্তু ধরা–ছোঁয়ার বাইরে নয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। ইচ্ছে করলে তিনি ছেলের নাম সমুদ্র রাখতে পারতেন। সমুদ্রও বিশাল এবং বিস্তৃত। সমুদ্রকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। তার চেয়েও বড় কথা, সমুদ্রে আকাশের ছায়া পড়ে। কিন্তু তিনি সমুদ্র নাম না রেখে রাখলেন হিমালয়। কঠিন মৌন পর্বতমালা, যার গায়ে আকাশের ছায়া পড়ে না ঠিকই কিন্তু সে নিজেই আকাশ স্পর্শ করতে চায়। হিমুর বাবা চেয়েছিলেন হিমু একজন মহাপুরুষ হবে, যে মহাপুরুষ পরম সত্য জানেন। কিন্তু হিমু কি চেয়েছিল? আমরা তার বাবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানি, হিমুর আকাঙ্ক্ষা জানি না। সে কিসের সন্ধান করে বা আসলেই সে কোন কিছুর সন্ধান করে কি–না তা নিয়েই লেখা হল 'দরজার ওপাশে'। যদিও আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে লেখাটি লিখেছি তবু বিনীত অনুরোধ করছি কেউ যেন গুরুত্বের সঙ্গে লেখাটি গ্রহণ না করেন। মিসির আলী নামে আমার একটি চরিত্র আছে। সে কাজ করে লজিক নিয়ে। তার চিন্তাভাবনা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় কিন্ত হিমু কাজ করে 'এন্টি–লজিক' নিয়ে। আমাদের এই জগতে 'এন্টি–লজিকে'র স্থান নেই।

হুমায়ূন আহমেদ
৫ই মে ১৯৯২

১

ঘুমের মধ্যেই শুনলাম কে যেন ডাকল, হিমু, এই হিমু।

গলার স্বর একইসঙ্গে চেনা এবং অচেনা। যে ডাকছে তার সঙ্গে অনেক আগে পরিচয় ছিল, এখন নেই। মানুষটাকে ভুলে গেছি, কিন্তু স্মৃতিতে তার গলার স্বর রয়ে গেছে। পুরুষালী ভারী গলা। একটু শ্লেষ্মা জড়ানো। আমি আধোঘুমে জবাব দিলাম, কে? কেউ উত্তর দিল না। ভয়াবহ ধরনের নিরবতা। আমি আবার বললাম, কে, কে ওখানে? ছোট্ট করে কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলল। আশ্চর্য! নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটাও আমার চেনা। টুক টুক করে দু'বার শব্দ হল দরজায়। দরজার ওপাশের মানুষটি চাপা গলায় ডাকল, হিমু, এই হিমু। আমার অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। ঘর অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়েছি। রেডিয়াম ডায়ালের টেবিল ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়ার কথা না, কিন্তু সবকিছু পরিস্কার দেখছি। ঐ তো দেয়ালের ক্যালেণ্ডার দেখা যাচ্ছে। ক্যালেণ্ডারের লেখাগুলি পর্যন্ত পড়তে পারছি। এর মানে কি? এটা কি তাহলে স্বপ্ন? পুরো ব্যাপারটা ঘটছে স্বপ্নে? দরজার ওপাশে আসলে কেউ নেই? চেনা এবং অচেনা গলায় আমাকে কেউ ডাকছে না? ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি, এবং ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারছি এটা স্বপ্ন। স্বপ্নটা শেষ পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছা করছে না। আমি দরজা খুলে দেখতে চাই না — দরজার ওপাশে কে দাঁড়িয়ে আছে। আমার জানার কোন ইচ্ছা নেই — ভারি গলায় কে আমাকে ডাকছে। আমি জেগে ওঠার চেষ্টা করছি। জাগতে পারছি না। কেউ আমাকে স্বপ্নের শেষটা দেখাতে চায়, আমি দেখতে চাই না। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ঘুমের মধ্যেই ছটফট করতে করতে আমি জেগে উঠলাম।

ঘরের হাওয়া গরম হয়ে আছে। দরজা-জানালা বন্ধ। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি বাতি জ্বাললাম। স্বপ্নে দেয়ালে যে জায়গায় ক্যালেণ্ডার ছিল সেখানে ক্যালেণ্ডার নেই। খাটের নিচে টকটক শব্দ হচ্ছে। প্রায়ই হয়। কিসের শব্দ আমার জানা নেই। ইঁদুর হবে না, ইঁদুর টকটক শব্দ করে না। আমি হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুললাম।

ভোর হয়েছে। আলো হয়ে আছে চারদিক। আমার দরজা-জানালা বন্ধ ছিল বলেই ঘর হয়েছিল অন্ধকার। বারান্দায় এসে দেখি, পাশের ঘরের বায়েজিদ সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছেন। তাঁর চোখ টকটকে লাল। এটা কোন নতুন ব্যাপার

না। বায়েজিদ সাহেবের চোখ সব সময়ই লাল। তিনি আমাকে দেখে নিচু গলায় বললেন, কি ব্যাপার হিমু সাহেব? এত সকালে জেগে উঠেছেন, ব্যাপার কি?

'ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

'সুবেহ সাদেকের সময় ঘুম ভাঙ্গা ভাল। এই সময় আল্লাহ পাক বেহেশতের জানালা খুলে রাখেন। ঐ জানালা দিয়ে বেহেশতের হাওয়া আসে পৃথিবীতে। ঐ হাওয়া যাদের গায়ে লাগে তারা বেহেশতবাসী হয়।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

তিনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, শোনা কথা।

'আপনি কি এই জন্যেই রোজ ভোরে উঠে বেহেশতের হাওয়া গায়ে লাগান?'

বায়েজিদ সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন। ভোরবেলায় অদ্ভুত আলোর কারণেই তাঁকে আজ অনেক কম বয়স্ক মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁকে দেখে আমার সবসময় মনে হয়েছে তাঁর গা থেকে কেউ একজন লেবুর মত সমস্ত রস চিপে নিয়ে নিয়েছে। হাঁটেন খানিকটা কুঁজো হয়ে। চোখে চোখ পড়লে চোখ নামিয়ে নেন। রাস্তায় দেখা হলে যদি জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন বায়েজিদ সাহেব? তিনি বিব্রত গলায় কোন রকমে বলেন, এই আছি। ছুটির দিনে তিনি তাঁর ঘরে থাকেন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকে। ছুটির দিনগুলিতে মেসে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়। সবাই একসঙ্গে বসে খায়। তিনি কখনো বসেন না। সবার খাওয়া হয়ে গেলে এক সময় চুপি চুপি খেতে যান। মাথা নিচু করে অতি দ্রুত খাবার পর্ব শেষ করেন। যেন খাওয়া একটা অন্যায় কাজ। যত দ্রুত শেষ করা যায়, তত ভাল। এই লোক আমাকে দেখে এতগুলি কথা বলবে, ভাবা যায় না। আমি তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললাম, বেহেশতের জানালা খোলার ব্যাপার যখন আছে তখন দোজখের জানালা খোলার ব্যাপারও থাকার কথা। ঐটা কখন খোলা থাকে জানেন?

'রাত বারোটা থেকে সুবেহ সাদেকের আগ পর্যন্ত। এই জন্যে এই সময় ঘরের ভেতর থাকার বিধান আছে। সবই অবশ্য শোনা কথা। সত্য মিথ্যা জানি না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সত্যি হলে আমার জন্যে খুব মুশকিল। আমার অভ্যাস হল গভীর রাতে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা।

বায়েজিদ সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি জানি। তবে আপনার জন্যে কোন সমস্যা নেই।

'সমস্যা নেই কেন?'

'আপনি সঠিক মানুষ।'

'আমি সঠিক মানুষ আপনাকে কে বলল? রাত-বিরাতে রাস্তায় হাঁটলেই মানুষ সঠিক হয়ে যায়? তাহলে তো চোর এবং পুলিশ সবচে' বড় সঠিক।'

বায়েজিদ সাহেব আবার মাথা নিচু করে ফেললেন। সম্ভবত তিনি আর কথা বলবেন না। একদিনে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগছে। ভদ্রলোক দু'বছরের উপর আমার পাশের ঘরে আছেন। এই দু'বছরে তাঁর সঙ্গে আমার তিন চার বারের বেশি কথা হয়নি। সেই সব কথাও — 'কেমন আছেন বায়েজিদ সাহেব?' 'এই আছি।' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোক কি করেন, তাঁর দেশ কোথায়, তাঁর চোখ সবসময় টকটকে লাল কেন কিছুই জানি না।

'বায়েজিদ সাহেব।'

'জ্বি।'

'কাল রাতে অনেকক্ষণ জেগেছিলাম। রেসকোর্সের ভেতরে হেঁটে হেঁটে দোজখের হাওয়া লাগাচ্ছিলাম। বৃষ্টি যখন শুরু হল তখন ঘরে এসেছি। এত সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গার কথা না। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গেছে। স্বপ্নটা পুরোপুরি দেখতেও পারিনি। মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্ন। দেখতে ইচ্ছা করছিল না বলে দেখিনি। জেগে উঠেছি।'

বায়েজিদ সাহেব শান্ত গলায় বললেন, সুবেহ সাদেকের সময় আল্লাহপাক কাউকে দুঃস্বপ্ন দেখান না।

'তাই না-কি?'

'জ্বি। সুবেহ সাদেক খুব একটা ভাল সময়। এই সময় আল্লাহপাক মানুষকে মঙ্গলের কথা বলেন, আনন্দের কথা বলেন।'

'এটাও কি মওলানার কাছ থেকে শোনা কথা?'

'জ্বি-না, আমার স্ত্রীর কথা। সে জীবিত নেই। উনিশ বছর আগে মারা গেছে। আমার কন্যার জন্মের সময় মারা গেল। সে জীবিত থাকার সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত। তখন হাসাহাসি করতাম। এখন করি না। এখন তার সব কথাই সত্যি মনে হয়।'

'বেহেশত এবং দোজখের জানালার কথাও কি তাঁর কথা?'

'জ্বি।'

'আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আপনি আর বিয়ে করেন নি?'

'জ্বি-না।'

'আপনার মেয়েটির বয়স তাহলে এখন উনিশ।'

'জ্বি।'

'তাঁর কি বিয়ে হয়েছে?'

'জ্বি-না।'

'সে থাকে কোথায়?'

'তার মামাদের কাছে থাকে। নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলাম। সামর্থ্য হল না। অতি ছোট চাকরি করি। বেতন যা পাই তা দিয়ে ঢাকায় ঘর ভাড়া করে

থাকা সম্ভব না।'

'আমি আপনাকে অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।'

'জ্বি–না। আমি কিছুই মনে করি নি। আমি খুব খুশি হয়েছি। অনেক দিন থেকে আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। সাহসে কুলায়নি।'

'আমাকে বলতে চাচ্ছিলেন কেন?'

'আপনি মহাপুরুষ ধরনের মানুষ। আপনি আমার মেয়েটার জন্যে একটু প্রার্থনা করলে তার মঙ্গল হবে, এই জন্যে। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছি না। দুষ্ট লোকজন আমার মেয়েটার নামে বাজে একটা দুর্নাম ছড়িয়েছে। পুরো ব্যাপারটা যে মিথ্যা সবাই জানে, কেউ বিশ্বাস করে না, আবার সবাই বিশ্বাস করে। মেয়েটা খুব কষ্টে আছে ভাই সাহেব। আমি জানি, আপনি মেয়েটার কষ্ট কমাতে পারবেন। আমার মেয়েটা যে কত ভাল তা একমাত্র আমি জানি আর জানেন আল্লাহপাক। আপনার কাছে আমি হাতজোড় করছি।'

বায়েজিদ সাহেব সত্যি সত্যি হাতজোড় করলেন। আমি বিব্রত গলায় বললাম, ভাই, আপনি আমার হলুদ পাঞ্জাবী, লম্বা দাড়ি–গোঁফ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন। আপনার দোষ নেই, অনেকেই হয়। বিশ্বাস করুন, আমি মহাপুরুষ না। অতি সাধারণ মানুষ। প্রচুর মিথ্যা কথা বলি, অনেক ধরনের ভড়ং করি। মানুষকে হকচকিয়ে দেয়ার একটা সচেতন চেষ্টা আমার মধ্যে থাকে। কাজকর্ম করার কোন ক্ষমতা নেই বলেই আমি ভবঘুরে। বুঝতে পারছেন?

বায়েজিদ সাহেব আগের মত কোমল গলায় বললেন, আপনি একটু দোয়া করবেন আমার মেয়েটার জন্যে। অনেকদিন বলার চেষ্টা করেছি। সাহস পাইনি। আজ আল্লাহপাক সুযোগ দিয়েছেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ঠিক আছে, প্রার্থনা করলাম। অসম্ভব রূপবান এবং ধনবান ছেলের সঙ্গে আপনার কন্যার বিয়ে হবে। তারা দু'জনে মিলে ঘুরবে দেশ থেকে দেশান্তরে।

বায়েজিদ সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আপনার অসীম শুকরিয়া।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহাপুরুষদের মতই গম্ভীর ভঙ্গিতে নিচে নেমে গেলাম। ভাল যন্ত্রণা হয়েছে। আমাকে অলৌকিক ক্ষমতাধর মনে করে এমন লোকের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। একটা আশ্রম–টাশ্রম খুলে বসার সময় বোধহয় হয়ে এসেছে। কমন বাথরুম নিচে। এত ভোরে কেউ উঠেনি। বাথরুম খালি পাওয়া যাবে। কল ছেড়ে কিছুক্ষণ মাথা পেতে বসে থাকব। তারপর পর পর তিন কাপ চা খেতে হবে। রাতে ঘুম না হওয়ায় মাথা জাম হয়ে আছে। চা খেয়ে রফিকের বাসায় একবার যেতে হবে। সে গত এক সপ্তাহ ধরে দু'দিন পর পর আমার কাছে আসছে।

কখনো দেখা হচ্ছে না। সে এমন সময় আসে যখন আমি থাকি না। তার ব্যাপারটি কি, কে জানে?

বাথরুমের বেসিন অনেকদিন ধরেই ভাঙা। আজ দেখি নতুন বেসিন। বেসিনের উপর নতুন আয়না। মেসের মালিক বসিরুদ্দিন সাহেব খরচের চূড়ান্ত করেছেন বলে মনে হচ্ছে। বেসিনের কাছে না গিয়েও বলতে পারছি কোন রিজেকটেড বেসিন বসিরুদ্দিন সাহেব কুঁড়িয়ে এনে ফিট করে দিয়েছেন। আয়নাটাও হবে ঢাকা শহরের সবচে' সস্তা আয়না। মুখ দেখা যাওয়ার কোন কারণ নেই।

আয়না দেখলেই আয়নার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। খুবই ক্ষুদ্র ইচ্ছা এবং নির্দোষ ইচ্ছা। তবু অতি ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। একবার প্রশ্রয় দেয়া শুরু করলে সব ইচ্ছাকেই প্রশ্রয় দিতে মন চাইবে। "যে মানব সন্তান ক্ষুদ্র কামনা জয় করতে পারে সে বৃহৎ কামনাও জয় করতে পারে।" এই মহৎ বাণী আমার বাবার। চামড়ায় বাঁধানো তিনশ একুশ পৃষ্ঠার একটা খাতায় তিনি এইসব বাণী মুক্তার মত গোটা গোটা হরফে লিখে রেখে গেছেন। পুরো খাতাটাই হয়ত ভরে ফেলার ইচ্ছা ছিল। সময় পাননি। মাত্র চার দিনের নোটিসে তাঁকে পৃথিবী ছাড়তে হল। জ্বর হল। জ্বরের চতুর্থ দিনে বিস্ময় এবং দুঃখ নিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হল। আমাকে হতাশ গলায় বললেন, আসল কথা তোকে কিছুই বলা হল না। অল্প কিছু লিখেছি — এতে কিছুই হবে না। তিনি আঠারো পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেছেন। কিছু কিছু বাণী লেখার পর আবার কেটে ফেলা হয়েছে, তাঁর পছন্দ হয়নি। বাণীর মধ্যেও ভেজাল আছে। এ রকম একটা ভেজাল বাণী হল :

"হে মানব সন্তান, সুখের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা কর। যে সুখের স্বরূপ জেনেছে সে দুঃখ জেনেছে। দুঃখের বাস সুখের মাঝখানে।"

এই বাণী লাল কালি দিয়ে কেটে তার নিচে বাবা লিখেছেন — ভাব অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে।

কলের নিচে মাথা পেতে মনে হল জগৎ সংসারে সবটাই কি অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে নয়? স্বপ্নকে আমরা অস্পষ্ট বলি। বাস্তব কি স্বপ্নের চেয়েও অস্পষ্ট নয়?

শুধু মাথা ভেজানোর জন্যে গিয়েছিলাম, পুরো শরীর ভিজিয়ে ফেললাম। আরাম লাগছে। একটু শীত ভাব হচ্ছে — আরামদায়ক শীত ভাব। অর্থাৎ আমি সুখ পাচ্ছি। এই সুখের স্বরূপ জানলেই দুঃখ কি তা জেনে ফেলব। ভেজাল বাণী তাই বলেছে। চোখ বন্ধ করে কলের নিচে মাথা পেতে আছি। সারাদিন এভাবে বসে থাকলে কেমন লাগবে? চোখ বন্ধ থাকায় বৃষ্টির মত লাগছে। মনে হচ্ছে আষাঢ় মাসের মুষল বর্ষণে গা পেতে আছি।

মেসের ঠিকা ঝি ময়নার মা'র কথা কানে না এলে কল্পনা আরো ফেনানো যেত। ময়নার মা চলে এসেছে। সে কথা না বলে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না।

আশেপাশে কেউ নেই বলে কথা বলছে বাসনগুলির সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে কথা বললে তেমন কৌতূহলী হতাম না। বাসন কোসনের সঙ্গে কথা বলছে বলেই কৌতূহলী হয়ে শুনতে হচ্ছে। মানুষ শুধু যে প্রাণী জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তাই না, জড় জগতের সঙ্গেও চায়।

ময়নার মা চাপা গলায় গভীর বেদনার সঙ্গে বলছে, চেপ্টা থালা। আমিও চ্যাপ্টা, তুইও চ্যাপ্টা। আমার চ্যাপ্টা কপাল, তরও চ্যাপ্টা কপাল। কান্দাভাঙা ডেকচি। তর যেমন কান্দাভাঙা, আমারও কান্দাভাঙা। তর কান্দা ভাঙছি আমি ময়নার মা। ক' দেহি আমার কান্দা কে ভাঙছে?

ময়নার মা'র কথা শোনার ইচ্ছা করছে, ক্ষুদ্র এবং নির্দোষ ইচ্ছা। এটা ঠিক হচ্ছে না। কলের পানি আরো জোরে ছাড়তে পারলে কাজ হতো। পানিতে আর জোর নেই। আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম। ময়নার মা আমাকে দেখে লম্বা ঘোমটা দিল। ঘোমটার আড়াল থেকে বলল, আব্বার শইল ভাল? সে গোড়া থেকেই আব্বা ডাক ধরেছে। নিষেধে কাজ হয়নি।

'ভাল। তুমি কেমন আছ, ময়নার মা?'

'আমি হইলাম আফনের কান্দাভাঙা ডেগ। আফনের মাথার দরদ কমছে?'

'কয়েকদিন হচ্ছে না।'

'বদ্যি গেরামের একখান তেল আছে, মাথার দরদে খুব আরাম। আফনেরে আইন্যা দিমু।'

'আচ্ছা দিও।'

'দেশের বাড়িত কেউ নাই, যাওয়া পড়ে না। আফনের জইন্যে যামু।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার দিক থেকে কোন সাড়া পেলে সে কথা বলা থামাবে না।

'মাথায় দরদ ভাল জিনিস না। ময়নার বাবা মরল মাথার দরদে। ফাল্গুন মাসে আমারে পরথম বলল, আইজ কামে যামু না — মাথার মইদ্যে দরদ। আমি কইলাম এইটা কেমুন কথা? মাথার মইদ্যে দরদ হইছে বইল্যা কাম কামাই করবেন? যান কামে যান। তা ধরেন মানুষটা গেল . . . ।

ময়নার মা'র এই গল্প আগেও কয়েকবার শোনা। আবারো শুনতে হচ্ছে। ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছি। শুনতে মোটেও ইচ্ছা করছে না। গল্পটা আবার বলতে পেরে সে যতটা আনন্দ পাচ্ছে আমি ঠিক ততটাই বিরক্ত হচ্ছি। সব মিলে সমান সমান।

রফিকের কাছে যাব বলে ভেবেছিলাম তার প্রয়োজন হল না। ভেজা কাপড়ে দোতলায় উঠে দেখি রফিক বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত সুপুরুষ

একজন মানুষ। আমার ধারণা, সে ছেঁড়া শার্ট গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে রাজপুত্রের মত লাগবে। সে শেভ করেনি। মুখে খোচা খোচা দাড়ি। তার পরেও এত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি আনন্দিত গলায় বললাম, কি খবর রফিক?

রফিক একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। জবাব দিল না। চুপ করে রইল। প্রশ্ন করলে সে কখনো জবাব দেয় না। আগে কিছুটা দিত, ইদানীং একেবারেই দিচ্ছে না। ব্যাপারটা যত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে আসলে তত অস্বাভাবিক না। প্রশ্ন করলে চুপ করে থাকার কারণ সে নিজেই ব্যাখ্যা করছে। সেই ব্যাখ্যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় স্যারেরা তাকে প্রশ্ন করতেন, পড়া ধরতেন। সে যে উত্তরই দিত মার খেতে হত। মার খেতে খেতে প্রশ্নের উপরই তার এক ধরনের ভীতি জন্মে গেছে। প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না, গম্ভীর হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে প্রশ্নের উত্তরে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। তার কাছে কিছু জানতে হলে এমনভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় যেন কখনো প্রশ্ন বলে মনে হয় না।

'দাঁড়া কাপড় ছাড়ি। তারপর চা খেয়ে আসি। তুই কয়েকবার আমার খোঁজ করেছিস। ব্যাপার কি?'

রফিক চুপ করে রইল। চুপ করে থাকবে, জানা কথা। শেষের দিকে প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি কাপড় ছাড়লাম। শার্ট-প্যান্ট পরতে পরতে বিরক্ত গলায় বললাম, কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকলে তো কোন লাভ হবে না। কিছু বলার থাকলে বলে ফেল।

'তোর কোন মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে?'

'কেন?'

রফিক নিঃশ্বাস ফেলল। কিছু বলল না। আমি হতাশ গলায় বললাম, তুই যা বলার বলে চলে যা। আমি নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করব না।

'চাকরি চলে গেছে। সাসপেনশন অর্ডার হয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি কিছুই করি নি। সুপারিনটেনডেন্ট ইনজিনিয়ার এসেছিলেন। আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি জবাব দিলাম না। উনি মনে করলেন আমি ইচ্ছা করে বেয়াদবী করছি।'

'যারা তোকে চেনে, তোর সঙ্গে কাজ করে, তারা তো তোর স্বভাব-চরিত্র জানে। তারা কিছু বলল না? তারা তো জানে তোকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তুই চুপ করে থাকিস।'

রফিক নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কেউ আমার পক্ষে কিছু বলে নি। আমার সাসপেনশন অর্ডার হওয়ায় সবাই খুশি। কেউ আমাকে দেখতে পারে না।'

'তোকে দেখতে পারার তো কোন কারণ নেই।'

'আমাকে শো কজ করেছিল। শো কজের জবাব দিয়েছি। জবাব ওদের পছন্দ হয় নাই। সবাই বলেছে আমাকে ডিসমিস করে দেবে।'

'শো কজে কি লিখেছিলি? কথা বল গাধা। তোকে কোন প্রশ্ন করছি না — এম্নি জিজ্ঞেস করলাম।'

রফিক চুপ করে রইল। আমি বিরক্ত গলায় বললাম, ওদের কোন দোষ দিচ্ছি না। আমি তোর বস হলে অনেক আগেই ডিসমিস করে দিতাম। প্রশ্নের জবাব দে যাতে বুঝতে পারি ব্যাপারটা কি। শেষ প্রশ্ন।

'কবে শো কজ করেছে? কবে জবাব দিয়েছিস?'

এক বাক্যে ডবল প্রশ্ন। রফিক শুধু ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। আমি জবাবের জন্য অপেক্ষা করলাম না। চা খাবার জন্য রওনা হলাম। রফিক ক্ষীণ স্বরে বলল, অনেক আজেবাজে কথা শো কজে লিখেছে — আমি নাকি কাজ জানি না, কাজের প্রতি আমার আগ্রহ নাই। ইনসাবর্ডিনেশন। মনটা খারাপ হয়েছে। তোর জানাশোনা মন্ত্রী আছে?

এবার আমি চুপ করে রইলাম। চুপ করে থাকলে রফিক নিজেই কথা বলবে। রফিক বলল, আমার এক খালাত ভাইয়ের আত্মীয় আছে মন্ত্রী। খালাতো ভাইকে বললে হয়। বলতে ইচ্ছা করে না। খালাতো ভাইটা বিরাট বদ। তুই কোন মন্ত্রী চিনিস না, তাই না? চেনার অবশ্য কথা না। ভাল মানুষদের সঙ্গে মন্ত্রীর পরিচয় থাকে না। বদগুলির সঙ্গে থাকে। খালাতো ভাইটা একটা বদ এই জন্যেই . . . ।

রফিক কথা শেষ করল না। মাঝে মাঝে সে দীর্ঘ বাক্য শুরু করে। যেই মুহূর্তে মনে করে অনেক বেশি কথা বলা হয়ে গেল, সেই মুহূর্তে চুপ করে যায়। বাক্যটা শেষ পর্যন্ত করে না।

চায়ের টেবিলে দু'জন মুখোমুখি বসলাম। রফিক নাশতা করে এসেছে কি–না জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। জবাব দেবে না। দু'জনের নাশতা দিতে বললেই ভাল।

'রফিক, এই সপ্তাহেই তোদের বাড়িতে যাব। তোরা তো এখনো নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার কলোনিতে থাকিস? জবাব দিতে হবে না উপরে নিচে মাথা নাড়, তাহলে বুঝব।'

রফিক মাথা নাড়ল।

'নদীর কাছে না তোদের বাড়ি?'

রফিক আবার মাথা নাড়ল।

'তুই এক কাজ করতে পারবি — নদীর তীরে বালির ভেতর দু'টা গর্ত খুঁড়ে রাখতে পারবি? মানুষ–সমান গর্ত। যেন গর্তে ঢুকলে শুধু মাথাটা বের হয়ে থাকে। কাজটা করতে হবে পূর্ণিমার আগের দিন।'

রফিক বিরস গলায় বলল, আচ্ছা।

গর্ত কেন খুঁড়তে হবে, কি ব্যাপার, কিছুই জিজ্ঞেস করল না। এই স্বভাবই তাঁর না। পূর্ণিমার দিন তার বাড়িতে উপস্থিত হলে দেখা যাবে সে ঠিকই গর্ত খুঁড়ে বসে আছে।

পরোটা ভাজি দিয়ে গেছে। রফিক খাচ্ছে না। অর্থাৎ সে বাড়ি থেকে নাশতা করে বের হয়েছে। ভোররাতে রওনা না হলে এত সকালে কেউ ঢাকায় পৌঁছতে পারে না। এত ভোরে কে তাকে নাশতা বানিয়ে দিয়েছে? তার বউ? বছরখানিক আগে রফিক বিয়ে করেছে। যতদূর জানি, মেয়েটি চমৎকার। আপন–পর বলে তার মধ্যে কিছু নেই। সবাই আপন। প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে একবার রফিকের কাছে গিয়েছি। তার স্ত্রীর সঙ্গে সেবারই প্রথম দেখা। সে রাগী গলায় বলল, মাথা ব্যথা করছে আমাকে বলেননি কেন? আমি মাথাব্যথার এমন এক ম্যাসেজ জানি দু' মিনিটে ব্যথা উধাও হবে। দেখি মাথা নিচু করুন তো। বৌ–এর সঙ্গে তার মিল হয়নি। বউ বেশিরভাগ সময়ই বাপের বাড়িতে থাকে। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে না জানি, তবু জিজ্ঞেস করলাম, বউ তোর সঙ্গে থাকে, না বাপের বাড়ি থাকে?

'বাপের বাড়ি।'

'আসে না তোর এখানে?'

'আর আসবে না।'

রফিককে খুব চিন্তিত বা বিষাদগ্রস্ত মনে হল না। কখনো মনে হয় না। দুঃখিত বা বিষাদগ্রস্ত হবার ক্ষমতা সম্ভবত তার নেই। আমি সিগারেট ধরালাম। রফিকের দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিতেই সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সিগারেট খাই না। বউ পছন্দ করে না। তোর কোন চেনা মন্ত্রী নাই? মন্ত্রী ছাড়া কিছু হবে না।

আমি হালকা গলায় বললাম, একজন মন্ত্রীকে আমি খুব সামান্য চিনি। জহিরের বাবা। জহির আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। দেখি উনাকে বলে কোন ব্যবস্থা করা যায় কি–না। চিন্তা করিস না।

'আমি চিন্তা করি না।'

'তবে সমস্যা কি জানিস — আমি একটা কোন কথা বললেই তো মন্ত্রী শুনবে না। তিনি যেন মন দিয়ে আমার কথা শুনেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আরেক কাপ চা খাবি?'

রফিক জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। সে মনে হল আরো সুন্দর হয়েছে। বসে আছে কেমন হতাশ ভঙ্গিতে। বড় মায়া লাগছে। রফিকের সঙ্গে আমার পরিচয় কলেজে ওঠার পর। কোন একটা সমস্যা হলেই সে আমার কাছে এসে সমস্যাটা বলে নিশ্চিত হয়ে যায়। এখন সে বাড়ি যাবে পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হয়ে। পঞ্জিকা দেখে পূর্ণিমার দিন গর্ত খুঁড়ে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। কোন কারণে সেদিন ঝড়বৃষ্টি হলেও সে দমবে না। তার এই আনুগত্য আমার একার প্রতি

না, সবার প্রতি। এ ধরনের অন্ধ আনুগত্য শুধু পশুদের মধ্যেই দেখা যায়। রফিক পশু না, মানুষ। বুদ্ধিমান সৎ ভালমানুষ ধরনের মানুষ। এমন সুন্দর একজন মানুষ যে দেখলেই মনে হয় প্রকৃতি তার এই সৌন্দর্য কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী করেছে। সেই উদ্দেশ্য কি কে জানে?

'রফিক।'

'হুঁ।'

'তোর মা'র শরীর আশা করি ভালই আছে।'

'বেশি ভাল না। শিগ্‌গির মারা যাবেন। কিছু খেতে পারেন না। খুব না-কি গরম লাগে। সারাক্ষণ তালপাখা পানিতে ভিজিয়ে সেই পাখায় হাওয়া করতে হয়। ফ্যানের হাওয়া সহ্য হয় না।'

'হাওয়া কে করে? তুই?'

রফিক আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল না, পর পর দুটি প্রশ্ন করা হয়ে গেছে। তার জবাব দেবার কথা না।

২

পিচগলা রোদ উঠেছে।

রাস্তার পিচ গলে স্যাণ্ডেলের সঙ্গে উঠে আসছে। দু'টা স্যাণ্ডেলে সমানভাবে লাগলে কাজ হত, তা লাগেনি। ডান দিকেরটায় বেশি লেগেছে, বাঁ দিকেরটায় কম। শুধুমাত্র রোদের কারণে এই মুহূর্তে আমার ডান পা, বাঁ পায়ের চেয়ে লম্বা। আমি ইচ্ছা করে ডান পায়ের স্যাণ্ডেলে আরো খানিকটা পিচ লাগিয়ে দেড় ইঞ্চি হিল বানিয়ে ফেললাম। এখন আমাকে হাঁটতে হচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমার হাঁটার ভঙ্গি দেখে যে-কেউ মনে করতে পারে — উদ্দেশ্যবিহীন যাত্রা। আসলে তা নয়। দুপুর রোদে অকারণে হাঁটছি না। বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, বিশেষ পরিকল্পনা আছে। আমি যাচ্ছি মন্ত্রীর সন্ধানে। সরাসরি মন্ত্রী ধরা যাচ্ছে না। জহিরের মাধ্যমে ধরা হবে। সূক্ষ্ম পরিকল্পনার ব্যাপার আছে।

চৈত্র মাসের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে আমার গায়ে একটা গরম চাদর। চুল দাড়ি কাটা হয়নি বলে চেহারা হয়েছে ভয়ংকর। দু'টা অসমান পা নিয়ে হাঁটছি। তারপরেও আমাকে দেখে মনে হতে পারে আমি পুরো ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছি। কারণ আমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মাঝে মাঝে আয়েশ করে সিগারেটে টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ছি।

রাস্তাঘাট ফাঁকা। হরতাল হরতাল ভাব। প্রভেদ এই টুকুই — হরতালের সময় রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেপুলেদের মহানন্দে খেলতে দেখা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে না।

পথের ধারে বেলের সরবত বিক্রি হচ্ছে। সরবত যারা বিক্রি করে তাদের চোখে-মুখে তৃষ্ণার্তের ভঙ্গি থাকে। এই সরবতওয়ালার মধ্যে সেই ভঙ্গি খুব বেশিমাত্রায়। সে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এত আগ্রহ নিয়ে গত তিন বছরে কেউ আমার দিকে তাকায়নি। মানুষের আগ্রহকে উপেক্ষা করা ঠিক না। আমি থমকে দাঁড়ালাম সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে এবং হাসিমুখে বললাম, খবর ভাল?

বেচারা হকচকিয়ে গেল। কি বলবে ভেবে পেল না। তাকাল জগের দিকে। জগভর্তি হলুদ পানীয়, তার উপরে বরফের কুচি ভাসছে। আমার ধারণা, পৃথিবীতে যে ক'টি কুৎসিত পানীয় আছে বেলের সরবত তার মধ্যে এক নম্বর। দু' নম্বরে আছে তোকমার সরবত। তোকমার সরবত খাবার সময় মনে হয় ছোট ছোট কেঁচোর টুকরা পানিতে গুলে খেয়ে ফেলছি।

সরবতওয়ালার হকচকানো ভাব কমানোর জন্যে বললাম, বেলের সরবত কত করে?

'ডবল তিন টেকা। সিঙ্গেল দুই টেকা।'

'তোকমার সরবত বিক্রি করেন না?'

'জ্বি না। চলে না। ভাল জিনিসের কদর নাই।'

'দেখি এক সিঙ্গেল বেলের সরবত।'

'ডবল খান। ডবল শইলের জন্যে ভাল।'

'দিন ডবলই দিন।'

সরবতের জগের চারপাশে ভন ভন করে মাছি উড়ছে। যে পানিতে সরবত বানানো হয়েছে সেখানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কিলবিল করার কথা। বরফে আছে টাইফয়েডের জীবাণু। এরা না-কি ঠাণ্ডায় ভাল থাকে।

দু'টা বড় গ্লাসে সরবত ঝাঁকাঝাঁকি হচ্ছে। লেবু চিপে খানিকটা লেবুর রস দেয়া হল। মনে হচ্ছে, এক চিমটি লবণও মেশানো হল। একটা বোতল থেকে গোলাপজলের পানি ছিটানো হল। সামান্য তিন টাকায় এত কিছু পাওয়া যাচ্ছে। গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সরবতওয়ালা গম্ভীর মুখে বলল, মধু আর বেল এই দুই জিনিসের মধ্যে আল্লাহপাকের খাস রহমত আছে।

'তাই না-কি?'

'জ্বি। তয় মধু শইল গরম করে, আর বেল করে ঠাণ্ডা।'

'দুটা এক সঙ্গে খেলে কি হবে? শরীর চলে আসবে মাঝামাঝি অবস্থায়? ঠাণ্ডাও না, গরমও না। তাই না?'

সরবতওয়ালা সরু চোখে তাকাচ্ছে। আমি রসিকতা করছি কি-না বোঝার চেষ্টা করছে। তার সমগোত্রীয় কেউ রসিকতা করলে সে হেসে ফেলতো। আমাকে

সমগোত্রীয় মনে হচ্ছে না। এক ধাপ উপরের মনে হচ্ছে। উঁচু ক্লাসের রসিকতা অপমান হিসেবে ধরে নিতে হয়। তাই নিয়ম।

একটানে সরবত শেষ করে তৃপ্তির ভঙ্গি করে বললাম, আহ! শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জিনিস ভাল। অতি উত্তম!

সরবতওয়ালার মুখের অন্ধকার দূর হচ্ছে না। এটাকেও সে রসিকতার অংশ হিসেবেই মনে করছে। আমি চকচকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দিলাম। উদার গলায় বললাম, পুরোটা রেখে দিন। বখশিশ।

এইবার মুখের অন্ধকার কাটল। সরবতওয়ালা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোকমার সরবত খাইতে চাইলে আইসেন। আইন্যা রাখব। ইসপিসাল বানায়ে দিব। খায়া আরাম পাইবেন।

'কবে আসব?'

'শুক্কুর বারে আইসেন। বুধবারে দেশে যাব। শুক্কুরবার সকালে ফিরব।'

'এইখানেই পাওয়া যাবে আপনাকে?'

'জ্বে।'

'নিন ভাই একটি সিগারেট খান।'

সরবতওয়ালা হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মোটেই অস্বস্তি বোধ করল না। যে অধিকারের সঙ্গে সে নিল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে শুক্রবারে যদি আমি আসি সে তোকমার সরবত খাওয়াবে এবং দাম নেবে না। এরা এসব ব্যাপারে খুব সাবধান।

'নাম কি ভাই আপনার?'

'এমদাদ মিয়া।'

'যাই। ভাল সরবত খেলাম।'

'মনে কইরা আইস্যেন শুক্কুরবারে।'

দুপুর দু'টা, চৈত্র মাসের দুপুর দু'টা কারো বাড়িতে যাবার উৎকৃষ্ট সময় নয়। তারপরেও যাচ্ছি কারণ অসময়ে মানুষের বাড়িতে উপস্থিত হবার অন্য রকম মজা আছে। আমি অল্প যে কটি বাড়িতে যাই, ইচ্ছা করে অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে উপস্থিত হই। জহিরদের বাড়িতে একবার রাত দেড়টায় উপস্থিত হলাম। জহিরের বাবা তখনও মন্ত্রী হননি। হব হব করছেন এমন অবস্থা। কলিংবেল শুনে হবু মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোবারক হোসেন ভীতমুখে নিজেই নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। দু'জন কাজের লোক। তিনি হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে? হু আর ইউ?

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমার ডাক নাম হিমু। ভাল নাম হিমালয়। স্যার ভাল আছেন?

তিনি উত্তেজনায় দু'ইঞ্চির মত লম্বা হয়ে বললেন, আই সি। ব্যাপারটা কি?'

'জহির আছে? আমি জহিরের বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

ব্যারিস্টার সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ছেলের যে এই জাতীয় বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে তাই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। অধিক শোকে পাস্তুরীভূত অবস্থা।

'তুমি জহিরের বন্ধু?'

'জ্বি চাচা। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা ঢাকা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি?'

'আই সি।'

আমি মুখের বিনয়ী ভাব সারা শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যারিস্টার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, চাচী ভাল আছেন? উনি সঙ্গে সঙ্গে একটু দূরে সরে গেলেন। জহিরের বাবা বললেন, এত রাতে কি ব্যাপার?

'ওর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

'রাত ক'টা বাজে জান?'

'জ্বি না।'

'ওয়ান ফর্টি। রাত একটা চল্লিশে কেউ কারোর বাড়িতে অকারণে আসে আমার জানা ছিল না।'

'অকারণে আসিনি স্যার— অনেকদিন দেখা হয় না। ও ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ ভাল আছে। তোমার নাম কি যেন বললে? এভারেস্ট?'

'জ্বি না, এভারেস্ট না। হিমালয়। বাবা শখ করে রেখেছিলেন। উনার ইচ্ছা ছিল আমি হিমালয়ের মত হই। হা হা হা।'

'শোন হিমালয়, এখন বাসায় যাও। আমার ধারণা, তুমি নেশা টেশা করে এসেছ। নেশাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে হৈ চৈ করে লাভ নেই বলে চুপ করে আছি। জহিরের সঙ্গে দেখা করতে হলে সকালে বা বিকেলে আসবে। আন আর্থলি টাইমে আসবে না। মনে থাকবে?'

'জ্বি স্যার মনে থাকবে।'

আমি পা ছুঁয়ে সালাম করবার জন্যে নিচু হলাম। দু'জনই খানিকটা সরে গেলেন। ঠিক তখন, "কার সঙ্গে কথা বলছ মা?" বলতে বলতে জহিরের ছোট বোন তিতলী এসে দাঁড়াল। আমি হাসিমুখে বললাম, তিতলী ভাল আছ? এখনও ঘুমাওনি? একটা চল্লিশ বাজে। তিতলীও তার বাবা-মা'র মত কিংবা তাদের চেয়েও বেশিরকম চমকাল। কারণ সে আমাকে চেনে না, দেখেনি কোনদিন। আমি জহিরের কাছ থেকে ওর নাম জানি। চেহারায় মিল দেখে আন্দাজে তিতলী বললাম।

একটা পুরো পরিবারকে হকচকিয়ে দেবার মধ্যে আনন্দ আছে। জহিরদের

পরিবার নিয়ে এ জাতীয় আনন্দ আরো কয়েকবার পাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তা সম্ভব হয়নি। কারণ ঐ ঘটনার ছ' মাসের মধ্যে জহিরের বাবা মন্ত্রী হয়ে গেলেন।

কিছু কিছু লোক মন্ত্রী-কপাল নিয়ে জন্মায়। জিয়া, এরশাদ যেই থাকুক, এরা মন্ত্রী হবেই। জহিরের বাবা এরকম একজন ভাগ্যবান মানুষ।

মন্ত্রীদের বাড়ি রাত দেড়টা বা দু'টোর সময় যাওয়া সম্ভব না। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে বাঁশডলা দেবে। দুপুরের দিকে যাওয়া যায়। এই সময় দর্শনার্থীর ভীড় থাকে না। তবে দুপুরে ঢুকলেও সরাসরি বাড়িতে যাওয়া যায় না। গেটে পুলিশের কাছে স্লিপ দিতে হয়। সেই স্লিপ একজন ভেতরে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার কাজটা করে নিতান্তই অনিচ্ছায়। যেন সে হাঁটা ভুলে গেছে। হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে নতুন হাঁটা শিখছে।

জহিরের আচার আচরণ, ভাবভঙ্গি কোনটাই মন্ত্রীর ছেলের উপযোগী নয়। কোন কালেও ছিল না। বোহেমিয়ান ধরনের ছেলে। ঘর-পালানো রোগ আছে। কোন কারণ ছাড়াই দেখা যাবে হঠাৎ একদিন হাঁটা ধরেছে। কোনবারই নিজ থেকে ফিরে না। লোকজন পাঠিয়ে ধরিয়ে আনতে হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। তবে বছর কয়েকের মধ্যে পালায়নি। রোগ সম্ভবত সেরেছে। তাকে দেখলাম গেটের পুলিশ দু'জনের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মুখভর্তি পান। চিবুক গড়িয়ে পানের রস পড়ছে। আমি কোন একটা মজার গল্পের মাঝামাঝি উপস্থিত হলাম। পুলিশ দু'জন অত্যন্ত সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। চাদর গায়ে মন্ত্রীদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করা সম্ভবত নিষেধ। দু'জন পুলিশই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার চাদরের দিকে। জহির পানের পিক ফেলে উঠে এল। আমাকে হাত ধরে রাস্তার ও-পাশে নিয়ে নিচু গলায় বলল, কি কাজে এসেছিস চট করে বলে চলে যা দোস্ত। বাবা এসে যদি দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছি, সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুলিশের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আড্ডা দেই। এতেই বাবা সারাক্ষণ নাইনটি নাইন হয়ে থাকে। বাড়িতে তোর পজিশন পুলিশের চেয়েও খারাপ। মন্ত্রী হবার পর বাবার মেজাজ যা হয়েছে। আমাকে দেখতেই পারে না। শূল কিভাবে বানানো যায় এই কায়দা জানা থাকলে বাবা নিজেই কাঠমিস্ত্রি ডাকিয়ে একটা শূল বানিয়ে রাখত। সকাল বিকাল আমাকে শূলে চড়াত। লাইফ হেল হয়ে যাচ্ছে দোস্ত।

'বাসায় তোর অবস্থা তাহলে কাহিল?'

'কাহিল বলে কাহিল — 'Gone' অবস্থা।'

'কাজকর্ম কিছু করছিস?'

'কাজকর্ম জানি কি যে করব? কাগজে কলমে এক প্লাস্টিক কোম্পানির এ্যাডভাইজার। মাসে দশ হাজার টাকা দিয়ে যায়। তাও আমার কাছে না — বাবার

কাছে।'

'তুই প্লাস্টিক কোম্পানির এ্যাডভাইজার? কি এ্যাডভাইজ করিস?'

'আরে দূর দূর, কি এ্যাডভাইজ করব? আমি প্লাস্টিকের জানি কি? সকালবেলা ওদের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। আমার একটা ঘর আছে, ঐখানে বসে তিন চার কাপ কফি খাই, চলে আসি। এখন বল দোস্ত কি জন্যে এসেছিস? টাকা ধার চাইতে এলে কিচ্ছু করতে পারব না। হাতে একটা ফুটা পয়সাও নাই। বিশ্বাস কর। বন্ধুবান্ধবরা আসে — চাকরি বাকরি নেই — বড় মায়া লাগে। চাকরির ব্যবস্থা তো দূরের কথা, ঘরে নিয়ে যে এক কাপ চা খাওয়াব সেই উপায় নেই . . . আমার কোন বন্ধুবান্ধব ঘরে ঢুকতে পারবে না। বাবার হুকুম। কি জন্যে এসেছিস তাড়াতাড়ি বলে চলে যা দোস্ত। বাবা যে কোন সময় চলে আসবে। আজকাল তিনটার সময় আসে। দুই ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার বিদায়। তিনটা বোধহয় বাজে। তুই কোন সুপারিশ নিয়ে আসিসনি তো?'

'না।'

'বাঁচালি। বন্ধুবান্ধব কেউ এলেই বুকে ধাক্কা লাগে। মনে হয় সুপারিশ নিয়ে এসেছে। তোর ব্যাপারটা কি?'

আমি গলার স্বর নিচু করে বললাম, এক জায়গায় যাবি আমার সাথে?

'কোথায়?'

'জায়গাটার নাম হল ড্রেজার কলোনী। নারায়ণগঞ্জের কাছাকাছি।'

'সেখানে কি?'

'খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা। ড্রেজার দিয়ে নদী খুঁড়ে সেই বালি জমা করে কলোনী বানানো হয়েছে। চারদিকে চিক চিক করছে বালি। চাঁদের আলো যখন সেই বালিতে পড়ে — অসাধারণ দৃশ্য! আজ আবার পূর্ণিমা পড়ে গেল।'

'বলিস কি?'

জহিরের চোখ চকচক করতে লাগল। আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, ইন্টারেস্টিং একটা প্ল্যান করে রেখেছি। রফিককে তো চিনিস। ও থাকে ড্রেজার কলোনীতে। রফিক নদীর কাছাকাছি দু'টা গর্ত খুঁড়ে রাখবে। গলা পর্যন্ত হাইটে গর্ত। আমরা দু'জন গর্তে ঢুকে বসে থাকব। ঠেসে বালি দেয়া হবে। শুধু দু'জনের মাথা বের হয়ে থাকবে।

জহিরের চোখের ঝকঝকে ভাব আরো বাড়ল। কয়েকবার ঢোঁক গিলল। তার ঢোঁক গেলা মাছের টোপ গেলার মত। সে ফিসফিস করে বলল, এক্সাইটিং হবে বলে মনে হচ্ছে।

আমি গলার স্বর আরো নিচু করে বললাম, অবশ্যই এক্সাইটিং। তাছাড়া জিনিসটাও খুবই সায়েন্টিফিক।

'এর মধ্যে সায়েন্টিফিক আবার কি?'

'পুকুরে গোসল করার সময় আমরা কি করি? সারা শরীর পানিতে ডুবিয়ে মাথা বের করে রাখি। এখানেও তাই করব। সারা শরীর মাটিতে ডুবিয়ে মাথা বের করে রাখব।'

'তাতে লাভ কি?'

'মাটির সঙ্গে একাত্মতা।'

'এটা কি তোর অরিজিনাল আইডিয়া?'

'না, এই আইডিয়া ধার করা। জগদীশচন্দ্র বসু এই জিনিস করতেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়িতে যখন বেড়াতে যেতেন তখনি পদ্মার চড়ে গর্ত খুড়ে মাথা বের করে পড়ে থাকতেন। তাঁর ধারণা, এতে শরীরে বায়োকারেন্ট তৈরি হয়। সেই বায়োকারেন্টের অনেক উপকারী দিক আছে।'

জহির আরো দু'বার ঢোঁক গিলে ফিসফিস করে বলল, ইন্টারেস্টিং হবে তো?

'অবশ্যই ইন্টারেস্টিং। কল্পনায় দৃশ্যটা দেখ। ধু ধু করছে বালি। মাথার উপরে পূর্ণ চন্দ্র। জোছনার বান ডেকেছে। কোথাও জনমানব নেই। চাঁদের আলোয় শুধু দু'টা মাথা দেখা যাচ্ছে।'

'দু'টা মাথা না, একটা মাথা। শুধু তোরটা দেখা যাচ্ছে। আমি গর্তে ঢুকব না। ঘটনাটা কোন কারণে লিক হয়ে পড়লে বাবা সত্যি সত্যি আমাকে গর্তে ঢুকিয়ে মাটিচাপা দিয়ে দিবে। মাথা বের করে রাখার কনসেশান দেবে না। রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না। তবে আমি অবজার্ভার হিসেবে থাকব। চল যাই।'

আমরা নারায়ণগঞ্জের বাসে উঠে পড়লাম। জহির বলল, আজ সত্যি সত্যি জ্যোৎস্না তো।

'সত্যি জ্যোৎস্না। পঞ্জিকা দেখে বের হয়েছি।'

ব্যাপারটা যেমন কল্পনা করে রেখেছিলাম তেমন হল না। দেখা গেল ড্রেজার কলোনি জায়গাটা জনবহুল। বাড়িঘর গিজ গিজ করছে। এর মধ্যেই একটা ফাঁকা জায়গায় রফিক দু'টা গর্ত খুড়ে বিরস মুখে বসে আছে। সে একা না, তার সঙ্গে আরো লোকজন আছে। লোকজন তাকে বিরক্ত করে মারছে। প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে —

'এইখানে বিষয় কি ভাইজান? লাশ পুঁতা হবে?'

'লাশ কি দুইটা?'

রফিক সব প্রশ্নের জবাবে হাই তুলছে। আমাদের দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রের মত গলায় বলল, মা'র শরীর খারাপ, আমি চলে যাব।

কি ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই।

জহির শুরু থেকে না না করছিল — গর্ত দেখে তার উৎসাহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে আমার কানে কানে বলল, নিয়মটা কি? নেংটো হয়ে ঢুকব, না আন্ডারওয়্যার থাকবে?

'নেংটো হয়ে ঢোকাই নিয়ম। তুই ইচ্ছা করলে আন্ডারওয়্যার রাখতে পারিস।'

'কোন প্রয়োজন দেখছি না। করব যখন নিয়ম মাফিকই করব। নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়ার কোন মানে হয় না। হু কেয়ারস?'

আমরা তৎক্ষণাৎ গর্তে ঢুকলাম না। রাত এগারোটার দিকে লোকজন কমে যাবার পর ঢুকলাম। রফিক বিরসমুখে কোদাল দিয়ে বালি ফেলতে ফেলতে বলল, আমি থাকতে পারব না। তোদের মাটিচাপা দিয়ে বাসায় চলে যাব। মা'র শরীর খুবই খারাপ। আমার মোটেই ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে লোকজন জমে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

জহির বলল, তুই চলে যা। আমরা ম্যানেজ করে নেব। শুধু ভোরবেলা এসে আমাদের মাটি খুঁড়ে বের করিস।

রফিক বলল, তোদের শার্ট-প্যান্ট কি করব? বাসায় নিয়ে যাব, না পাশে রেখে দেব?

জহির বলল, শার্ট-প্যান্ট আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দে। আমার আর এইসবের দরকার নেই। আমি প্রকৃতির সন্তান। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসে থাকা যে এমন এক্সাইটিং আগে জানতাম না। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

রাত বারোটার মধ্যে আমাদের চারপাশে হাজার খানিক লোক জমে গেল। শুধু মানুষ না, পশুরাও ব্যাপারটায় খুব উৎসাহ পাচ্ছে। দু'টা কুকুর আমাদের ঘিরে ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করছে। লোকজনের প্রশ্নেরও কোন সীমা নেই।

'ভাই সাহেব, আপনারা কে?'

'এইখানে কি করতেছেন?'

'জিন্দা কবর নিয়েছেন?'

'আপনারা থাকেন কোথায়?'

আমি কোন প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছি না তবে জহির প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে। উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক জবাব। রাত একটার দিকে মনে হল পুরো নারায়ণগঞ্জের মানুষ জড়ো হয়েছে। বিকট হৈ চৈ। জহির বলছে — আপনারা হৈ চৈ করছেন কেন? নিরবতা কাম্য। দয়া করে নিরব থাকুন। প্রকৃতি নিরবতা পছন্দ করে।

দেড়টার দিকে পুলিশ চলে এল। ওসি সাহেব দু'জন কনস্টেবল নিয়ে নিজেই এসেছেন। ওসিরা সহজভাবে কোন কথা বলতে পারেন না। ইনিও পারলেন না। হুংকার দিলেন — কি হচ্ছে এসব? আপনারা কে?

জহির শীতল গলায় বলল, অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন? মানুষ এই ফিলসফিক প্রশ্নের

মীমাংসা গত দু'হাজার বছর ধরে করার চেষ্টা করেছে। মীমাংসা হয়নি।

'আপনারা আন্ডার এ্যারেস্ট। উঠে আসুন।'

জহির হিমশীতল গলায় বলল, আন্ডার অ্যারেস্ট মানে? মশকরা করছেন? আমরা দেশের কোন্ আইনটি ভঙ্গ করেছি দয়া করে বলুন। বাংলাদেশ পেনাল কোডের কোন্ ধারায় আছে যে গর্ত খুঁড়ে বসে থাকা যাবে না? আমরা যদি পানিতে শরীর ডুবিয়ে থাকতে পারি, তাহলে মাটিতেও পারি।

ওসি সাহেব যুক্তি–তর্কে গেলেন না। কনস্টেবল দু'জনকে হুকুম দিলেন আমাদের টেনে তুলতে। জহির হুংকার দিয়ে বলল, আমি কে পরিচয় দিলে আপনি কিন্তু ভাই প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবেন। প্যান্ট পাঠাতে হবে ধোপার কছে। ডবল চার্জ নেবে।

ওসি সাহেব সেপাইকে বললেন, এই পাগলার গালে একটা চড় দাও। সেপাই সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে লাথি বসিয়ে দিল।

জহির হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, বুঝলেন ভাই সাহেব, আপনাকে এমন জায়গায় ট্রান্সফার করা হবে যে এক পয়সা ঘুষ পাবেন না। হালুয়া টাইট হয়ে যাবে। একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি। টেলিফোন করে জেনে নিন আমি কে? পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে আদরে আদরে প্রাণ অতিষ্ঠ করে ফেলবেন।

ওসি সাহব বিরক্ত মুখে বললেন, পুলিশের আদর কত প্রকার ও কি কি — কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন।

আমরা থানার দিকে রওনা হলাম। উৎসাহী জনতার বড় একটা অংশ আসছে আমাদের পিছু পিছু। জহির আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, যতটা এক্সাইটিং হবে ভেবেছিলাম তারচে' দশগুণ এক্সাইটিং হয়েছে। এই জাতীয় প্রোগ্রাম আরো ঘন ঘন করতে হবে। নেক্সট পূর্ণিমা কবে? পূর্ণিমাগুলি একমাস পর পর আসে, না পনেরো দিন পর পর? সিস্টেমটা কি?

তেল ও জ্বালানী মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোবারক হোসেন সত্যি সত্যি জহিরের বাবা এই পরিচয় পাওয়ার পর ওসি সাহেবের মুখের হা তেলাপিয়া মাছের মত বড় হতে লাগল এবং ছোট হতে লাগল। তারপর উনি যখন শুনলেন মোবারক হোসেন সাহেব নিজেই ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে আসছেন তখন অধিক শোকে ওসি সাহেব পাথরের মত হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ জহিরের দিকে তাকান, খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকান। জহির বলল, আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন ওসি সাহেব, আমার বাবা বাইরের মানুষের কাছে অত্যন্ত মাই ডিয়ার ধরনের লোক। আপনাকে উনি কিছুই বলবেন না। তাছাড়া আপনাকে কিছু বলার প্রশ্নও আসে না। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন।

এর উত্তরে ওসি সাহেব চাপা গলায় বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, যার কিছুই বোঝা গেল না।

জহির বলল, ওসি সাহেব, চা খাওয়াতে পারেন?

এতেও ওসি সাহেবের হতভম্ব ভাব কাটল না। সেকেণ্ড অফিসার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এক্ষুণি চা-কেক নিয়ে আসছি স্যার। এক্ষুণি আনছি। জিলিপী খাবেন? এখানে গরম গরম জিলিপী পাওয়া যায়।

জহির বলল, জিলিপী খাওয়া যায়। আপনারা কেউ যদি কাইন্ডলি রফিকের বাসা থেকে আমাদের কাপড়গুলি এনে দেন তাহলে ভাল হয়। বাবা এসে যদি দেখেন আমরা আন্ডারওয়্যার পরে থানায় বসে আছি, উনি কিছুটা বিরক্ত হতে পারেন। মন্ত্রী মানুষ তো, সামান্যতেই বিরক্ত হন।

সেকেণ্ড অফিসার বললেন, আমি ব্যবস্থা করছি। স্যার, আপনারা গা ধুয়ে নেন। শরীরভর্তি বালি। বাথরুমে সাবান আছে।

গা ধোয়ার আগেই তেল ও জ্বালানী মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোবারক হোসেন উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর পি. এ., দু'জন পুলিশ গার্ড। মোবারক হোসেন সাহেব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

আমি বললাম, স্যার ভাল আছেন?

তিনি জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছে তিনিও ওসি সাহেবের মত অধিক শোকে পাথর হয়ে পড়েছেন।

সমস্ত থানা জুড়ে এক ধরনের আতংক। পুলিশরা সব এ্যাটেনশন হয়ে আছে।

ব্যারিস্টার সাহেব ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা কি করেছিল বললেন, গর্ত খুঁড়ে বসেছিল?

'জ্বি স্যার। শুধু মাথা বের হয়ে ছিল। আমি খবর পেয়ে দু'জন কনস্টেবল নিয়ে উপস্থিত হলাম।'

'আই সি।'

'আমি স্যার পাগল ভেবেছিলাম — মানে স্যার, ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'বুঝতে পারার কথাও না। আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আপনাকে ধন্যবাদ। ঘটনাটা থানায় জিডি এন্ট্রি করে রাখুন। মন্ত্রীর ছেলে বলে পার পেয়ে যাবে, তা হবে না। আর এই ছেলে, যার নাম সম্ভবত হিমালয়, একে ভালমত জিজ্ঞাসাবাদ করুন। সে-ই বুদ্ধি দিয়ে এইসব করিয়েছে বলে আমরা ধারণা। ড্রাগ এডিক্ট হবার সম্ভাবনা। খুব ভালমত খোঁজ-খবর করবেন।'

'অবশ্যই করব স্যার।'

'আমি জহিরকে নিয়ে যাচ্ছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে টেলিফোন করবেন।'

'তার কোন প্রয়োজন হবে না স্যার।'

'প্রয়োজন হবে না বলবেন না। মন্ত্রীর ছেলে বলে সে কোন আলাদা ফেভার পাক তা আমি চাই না। মন্ত্রী জনগণের সেবক। এর বেশি কিছু না।'

সেকেণ্ড অফিসার সাহেব আমাদের কাপড় এবং চা-নাশতা নিয়ে এসেছেন। মন্ত্রী দেখে তার ভিরমি খাবার উপক্রম হল।

জহির বিরস মুখে শার্ট গায়ে দিল, প্যান্ট পরল।

মোবারক সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বললেন, চল বাবা, যাওয়া যাক। ভঙ্গিটা এমন যেন ছ'সাত বছরের একটা ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে কথা বলছেন। যে ছেলে না বুঝে দুষ্ট বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সামান্য অপরাধ করে ফেলেছে, যে অপরাধের শাস্তি বকাঝকা না — আদর। যাবার আগে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি এই জিনিসই চাচ্ছি। আমাকে যেন চিনে রাখেন। দ্বিতীয়বার দেখা হলে আমাকে যেন বলতে না হয় — আমি হিমু, হিমালয়।

তাঁরা চলে যাবারও আধঘন্টা পার হবার পর থানার পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হল। এই আধঘণ্টায় আমি দু'কাপ চা এবং তিন পিস কেক এবং ছ'টা জিলিপী খেলাম। অর্ধেকটা সিগারেট খেলাম। পুরোটা খাওয়া গেল না কারণ সেকেণ্ড অফিসার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, সিগারেট ফেলুন। নো স্মোকিং।

একটা পিরিচে আট দশটা খিলি পান। দু'টা নিয়ে একসঙ্গে মুখে দিয়ে দিলাম। আমার এই সব কর্মকাণ্ড সবাই দেখছে। বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখছে। তাদের ভাল লাগছে কিনা বুঝতে পারছি না। মনে হয় লাগছে না। চেয়ারে পা উঠিয়ে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসেছিলাম — সেকেণ্ড অফিসার কঠিন ভঙ্গিতে বললেন, পা নামিয়ে বসুন। আমি পা নামিয়ে বসলাম। হাত বাড়িয়ে পিরিচ থেকে আরো দু'টা পান নিয়ে মুখে দিয়ে সহজ স্বরে বললাম, পানের পিক কোথায় ফেলব স্যার?

ওসি সাহেব নড়ে চড়ে বসলেন। টেবিল থেকে আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, এবার বলুন আপনি কে।

'আমার নাম হিমালয়। ডাক নাম হিমু।'

'কি করেন?'

'কিছু করি না।'

'কিছু যে করেন না তা বুঝতে পারছি। এটা বোঝার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। থাকেন কোথায়?'

'একটা মেসে থাকি।'

'ঢাকায় আপনার আত্মীয়স্বজন আছেন?'

'আছেন।'

ওসি সাহেব ড্রয়ার থেকে কাগজ এবং পেনসিল বের করলেন। থানায় এই এক

মজার জিনিস দেখলাম। সব কাজকর্ম পেনসিলে। সম্ভবত ইরেজার ঘসে লেখা মুছে ফেলার চমৎকার সুযোগ আছে বলেই পেনসিল। ওসি সাহেব শুকনো মুখে বললেন, — এক এক করে আত্নীয়স্বজনের নাম বলুন, ঠিকানা বলুন। টেলিফোন থাকলে টেলিফোন নাম্বার। সব লিখে নেব। আমি বললাম, যেসব প্রশ্নের উত্তর লেখার দরকার নেই সেগুলি আগে করুন।

'সেগুলি আগে করব কেন?'

'কারণ আপনার পেনসিলটা ভোঁতা। শার্পনার দিয়ে শার্প করতে হবে। এখন কোন শার্পনার খুঁজে পাবেন না।'

ওসি সাহেব পেনসিলের দিকে তাকালেন। পেনিসলটা সত্যি ভোঁতা। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শার্পনার খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে পাওয়া গেল না। ড্রয়ার ঘাঁটাঘাটি করা হল। ফাইলপত্র উল্টানো হল — শার্পনার নেই। ওসি সাহেব একা না, অন্যরাও শার্পনার খোঁজায় যোগ দিল। ওসি সাহেব গর্জনের মত শব্দ করে বলতে লাগলেন, একটা পুরানো ব্লেড ছিল, সেটা গেল কই? এত বিশৃঙ্খলা! এত বিশৃঙ্খলা! আমি বললাম, একটা বল পয়েন্ট দিয়ে লিখলে কি চলে?'

তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। যেন এমন অদ্ভুত কথা তিনি তাঁর ওসি জীবনে শুনেন নি। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত এরকমই হয়। আমি জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা শার্পনার না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সব কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। একজন কাউকে দোকানে পাঠিয়ে একটা শার্পনার আনিয়ে নিলেই হয়, তা আনা হবে না। খোঁজা চলতেই থাকবে এবং সবার রাগ বাড়তে থাকবে। ধমকা-ধমকি হতে থাকবে।

হোটেল থেকে একটা ছেলে টিফিন ক্যারিয়ারে কি যেন নিয়ে এসেছে। রাত প্রায় শেষ হতে চলল। এ সময়ে খাবার কার জন্যে? ওসি সাহেব নিতান্ত অকারণে তার উপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন এই হারামজাদা, হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন — এইটা কি রং দেখার জায়গা?

কেউ আমার দিকে লক্ষ্য করছে না, কাজেই আবার পা উঠিয়ে বসা যাক। ওসি সাহেব আমার দিকে তাকালেন, বলুন আপনি কি করেন।

'আগে একবার বলেছি কিছু করি না। ঘুরে বেড়াই।'

'কোথায় ঘুরে বেড়ান?'

'পথে ঘাটে ঘুরি।'

'ভবঘুরে?'

'তা বলতে পারেন।'

'দেশে ভবঘুরে আইন বলে যে একটা আইন আছে তা কি জানেন? এই আইনে ভবঘুরেদের ধরে ধরে জেলে ঢুকিয়ে ফেলা যায়।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ভাগ্যিস এই যুগে কোন ধর্মপ্রচারক নেই।

ধর্মপ্রচারক থাকলে সমস্যা হয়ে যেত। জানেন বোধহয় ধর্মপ্রচারকরা সবাই বলতে গেলে ভবঘুরে। গৌতম বুদ্ধ, গুরু নানক, যিশু খৃষ্ট . . .'

'আপনি কি ধর্মপ্রচারক?'

'জ্বি না। তবে এই লাইনে চিন্তাভানা করছি। টাকা-পয়সা যোগাড় করতে পারলে একটা আশ্রম চালু করার ইচ্ছা আছে। মহাপুরুষ হবার একটা ক্ষুদ্র চেষ্টা বলতে পারেন।'

'মহাপুরুষ হবার চেষ্টা করছেন?'

'জ্বি।'

'কেন জানতে পারি?'

'সত্যি সত্যি জানতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বললাম, আমার নিজের দিক থেকে মহাপুরুষ হবার তেমন আগ্রহ নেই, তবে আমার বাবার খুব শখ ছিল ছেলেকে মহাপুরুষ বানাবেন। সাধারণ বাবারা ছেলেমেয়েদের ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, ব্যারিস্টার এইসব বানাতে চায়। কেউ মহাপুরুষ বানাতে চায় না। আমার বাবা চেয়েছিলেন।

'আমার সঙ্গে ফাজলামি করছেন?'

'জ্বি না। ফাজলামি করছি না।'

'শিয়ালের শিং দেখেছেন?'

'না।'

'শিয়ালের শিং আমি দেখিয়ে ছাড়ব। মহাপুরুষ কত প্রকার ও কি কি বুঝে যাবেন। গর্তে ঢুকে মহাপুরুষ? শূকর গর্তে ঢোকে, মহাপুরুষ না। এই মবিন, মবিন।'

মবিন নামের একজন কেউ ছুটে এল। ওসি সাহেব চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, একটা নাপিত ধরে নিয়ে আস। নাপিতকে বল এই মহাপুরুষের চুল, দাড়ি, ভুরু সব যেন কামিয়ে দেয়। মহাপুরুষগিরি বার করছি। অনেক মহাপুরুষ দেখা আছে — পেনসিল কাটার পাওয়া গেল?

'জ্বি না স্যার।'

'না শব্দ আমি শুনতে চাচ্ছি না। খুঁজে বার কর।'

ওসি সাহেবের নাম মোহম্মদ সিরাজুল করিম। তিনি দেখলাম আসলেই করিৎকর্মা লোক। শুধু যে করিৎকর্মা তাই না, বেশ সাহসীও। নাপিত ডাকিয়ে সত্যি সত্যি দাড়ি গোঁফ ভুরু সবই কামিয়ে দিলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, মহাপুরুষের হাতে একটা আয়না দাও। মহাপুরুষ তার চেহারাটা দেখুক।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, চেহারা দেখতে চাচ্ছি না। মহাপুরুষদের আয়নায় নিজেকে দেখা নিষেধ আছে। এতে নিজের চেহারার প্রতি এক ধরনের

মুগ্ধতা চলে আসে। এটা ঠিক না।

'ঠিক না হলেও দেখে রাখুন। চেহারা যে অবস্থায় এখনও আছে এই অবস্থা থাকবে না। মন্ত্রী সাহেব কি বলেছেন তা তো শুনেছেন? ভালমত জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলেছেন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শুধু মুখের কথায় হয় না। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ কঠিন জিনিস। শরীরের চামড়াটা শুধু থাকবে — হাড্ডি যা আছে পানি হয়ে পিশাবের সঙ্গে বের হয়ে যাবে।'

'মহাপুরুষদের প্রতি আপনার অকারণ রাগের কারণটা জানতে পারি? অবশ্যি বর্তমানে আপনার মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। ঘরে অসুস্থ স্ত্রী। প্রিয়জন ভয়াবহ রকমের অসুস্থ থাকলে মনমেজাজ ঠিক থাকে না। সারা পৃথিবীর উপরই রাগ লাগে।'

ওসি সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি আসলে আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়েছি। মাঝে মাঝে আমার আন্দাজ খুব লেগে যায়। এটা মনে হচ্ছে লেগে গেছে। মন্ত্রী দেখার পর ওসি সাহেবের যে অবস্থা হয়েছিল এখনও সেই অবস্থা। মনে হচ্ছে হাত–পা শক্ত হয়ে গেছে। তেলাপিয়া মাছের মত মুখের হা বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। ওসি সাহেবের গলার আওয়াজ খানিকটা নিচে নামল। তিনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমার স্ত্রী যে অসুস্থ এটা কি করে বললেন?

আমি হাসলাম। জবাব দিলাম না। একজন প্রথম শ্রেণীর ভবিষ্যৎবক্তা কথা বলবেন খুব কম। প্রশ্ন করলে অন্যদিকে তাকিয়ে হাসবেন।

'তাঁর কি অসুখ সেটা বলতে পারবেন?'

'না। আমি তো ডাক্তার না।'

'তাঁর এই রোগের কি কোন অষুধ আছে?'

'অবশ্যই আছে — সৃষ্টিকর্তা এমন কোন অসুখ তৈরি করেন নি যার প্রতিষেধক তাঁর কাছে নেই। আমাকে দয়া করে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি রোগের অষুধ সম্পর্কে কিছু জানি না।'

ওসি সাহেব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললেন, মহাপুরুষগিরি ফলানোর জায়গা পান না? স্ত্রী অসুস্থ? ভাওতাবাজি পুলিশের কাছে? বয়স তো খুব বেশি মনে হয় না। লোক–ঠকানো কায়দাকানুন সব জানা হয়ে গেছে — মবিন, মবিন।

মবিন চলে এল। মবিনের মুখ হাসি হাসি। কারণ তার হাতে পেনসিল কাটার। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সে খুশি খুশি গলায় বলল,

'পেনসিল কাটার পাওয়া গেছে।'

'পেনসিল কাটারের এখন আর দরকার নেই। বাবাজীকে হাজতে নিয়ে যাও। ভালমত আদর–যত্ন কর যাতে যতদিন বাঁচে পুলিশের খাতিরের ব্যাপারটা মনে থাকে। চুল দাড়ি কাটানো ঠিক হয়নি। চুল দাড়ি থাকলে আদর যত্নের সুবিধা হত।'

মবিন আনন্দিত স্বরে বলল, চুল দাড়ির কোন দরকার নাই স্যার। দেখেন না কি করি।

মবিন সাহেব কিছু করার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই তেল ও জ্বালানী মন্ত্রী মোবারক হোসেন সাহেব আমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে টেলিফোন করলেন। জহিরের চাপাচাপিতেই এটা করলেন, বলাই বাহুল্য। আমি যে খুব আনন্দিত হলাম তা না। পুলিশী মার খাবার চেষ্টা আমি অনেকদিন ধরেই করছি। ব্যাপারটা সম্পর্কে শুধু শুনেছি। অভিজ্ঞতাটা হয়ে যাওয়া ভাল। হেলাল গুণ্ডা বলে একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাল পরিচয় আছে। তার কাছ শুনেছি মারের সময় ব্যথা পাচ্ছি ভাবলেই ব্যথা পাওয়া যায়। ব্যথা পাচ্ছি না ভাবলে আর ব্যথা পাওয়া যায় না।

আমি থানা থেকে ছাড়া পেলাম রাত তিনটায়। এত রাতে আর ঢাকায় ফিরলাম না। চলে গেলাম নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ টার্মিনালে। রাত কাটাবার জন্যে লঞ্চ টার্মিনাল খুব ভাল জায়গা। অনেক খালি লঞ্চ বাঁধা থাকে। নজর এড়িয়ে তার একটায় ঢুকে পড়তে হয়। চুপিচুপি চলে যেতে হয় ছাদে। চাদর মুড়ি দিয়ে টানা ঘুম দিলেই হয়। লঞ্চের লোকজন এলে ভাববে তাদেরই কেউ।

আমার সঙ্গে চাদর আছে। শরীর ঢেকে ঘুমিয়ে পড়া কোন সমস্যা না।

তাই করলাম। ঘুম ভাঙল ভোর রাতে। লঞ্চ চলছে। কখন যাত্রী উঠল, কখন লঞ্চ ছাড়ল কে জানে? হু হু বাতাসে রীতিমত শীত ধরে গেছে। আকাশে থালার মত বড় চাঁদ। নদীর দু'পাশে গাছপালা চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এরা সবাই জেগে আছে। উথাল পাথাল জোছনায় গাছপালা ঘুমুতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়ে মানুষ। আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে চাঁদের আলো থেকে নিজেকে আলাদা করে আমি ঘুমুতে গেলাম।

ঘুম আসছে না। বারবারই মনে হচ্ছে একটা ছোট ভুল করা হয়েছে। ঢাকা ছাড়ার আগে রূপার সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার ছিল। ঢাকার বাইরে যতবারই যাই, এই কাজটা করি। এইবারই শুধু করা হল না।

মানুষের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা থাকলে চমৎকার হত। লঞ্চের ছাদ থেকে রূপার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা যেত।

'হ্যালো, হ্যালো রূপা?'

'তুমি! তুমি কোথায় এখন?'

'লঞ্চের ছাদে।'

'লঞ্চের ছাদে মানে? লঞ্চে করে যাচ্ছ কোথায়?'

'জানি না।'

'কি পাগলের মত কথা বলছ? তুমি লঞ্চে করে যাচ্ছ আর তুমি জান না কোথায় যাচ্ছ!'

'আমরা কে কোথায় যাচ্ছি কেউই তো জানি না।'

'আবার ফিলসফি শুরু করলে? শোন দার্শনিক, এগুলি নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ফিলসফি। পাঁচ হাজার বছর ধরে কপচানো। সত্যি করে বল তো কোথায় যাচ্ছ?'

'জানি না।'

'জান না?'

'না। জগতের পরম সত্য কি জান রূপা? জগতের পরম সত্য হচ্ছে — জানি না, I don't know. এই ফিলসফিটা কেমন লাগল?'

ঘুম এসে যাচ্ছে। কাল্পনিক কথাবার্তা আজকের মত থাক। লঞ্চটা বড্ড দুলছে। রেলিং দেয়া নেই। গড়িয়ে পড়ে না গেলেই হয়।

৩

সাতদিন পর ঢাকায় ফিরলাম। মানুষের মাথার চুল সাতদিনে ১.৫ মিলিমিটার বাড়ে। দাড়ি, গোঁফ এবং ভুরুর চুলও একই হারে বাড়ার কথা। ব্যাপার মনে হচ্ছে তা না। সাতদিনে আমার দাড়ি-গোঁফ কিছু গজিয়েছে। মাথার চুল তেমন গজায়নি। ভুরুর চুলের বৃদ্ধি সর্বনিম্ন পর্যায়ে। আগে যা ছিল এখনো তাই। আমার চেহারায় এক ধরনের ভৌতিক ভাব চলে এসেছে। ভৌতিক ভাবের জন্যে গায়ের চাদরও বোধহয় খানিকটা দায়ী।

চেহারায় ভৌতিক ভাব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি গত রাতে। স্টিমারে করে ফিরছি। ফার্স্টক্লাসের ডেক কেমন দেখার জন্যে উঁকি দিলাম। ডেক ফাঁকা। অল্পবয়েসী এক মা তার বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে। বাচ্চাটা হাত-পা ছুঁড়ছে এবং বিকট চিৎকার করছে। বাচ্চার বাবা বিব্রত মুখে এক গ্লাস পানি হাতে পাশে দাঁড়ানো। আমাকে দেখে বাচ্চা চোখ তুলে তাকাল। আর ঠিক তখন বাচ্চার মা নিচু গলায় বলল, "চুপ কর সোনা। চুপ না করলে ঐ ভূত তোমাকে খেয়ে ফেলবে।"

বাচ্চা চুপ করে গেল। আতংকগ্রস্ত হয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরল। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম, এবং গম্ভীর গলায় বললাম, আমি স্টিমারের দোতলায় আছি — বাচ্চা কান্নাকাটি করলে খবর দেবেন, এসে ভয় দেখিয়ে যাব। বাচ্চার মা লজ্জিত মুখে বলল, সরি সরি। কিছু মনে করবেন না।

'না কিছু মনে করি নি। আপনার বাচ্চা যথেষ্ট ভয় পেয়েছে কি-না দেখুন। প্রয়োজন মনে করলে আরো খানিকটা ভয় দেখিয়ে দিয়ে যাই।'

মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মেয়েটা দেখতে খানিকটা রূপার মত। ইচ্ছা করছিল আরো খানিকক্ষণ থাকি — সম্ভব হল না। বাচ্চাটা বেশি ভয় পেয়েছে। ভয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে।

আমাকে যে ভয়াবহ দেখাচ্ছে তার আরো প্রমাণ পেলাম। সেকেণ্ড ক্লাসে অন্য একটি বাচ্চা, তিন চার বছর বয়স হবে, আমাকে দেখেই কাঁদতে শুরু করল। এই বাচ্চাটি ছিল বাবার কোলে। সেই ভদ্রলোক বিব্রত গলায় বলতে লাগলেন — আহা, উনি কিছু করবেন না তো। কিচ্ছু করবেন না।

বড় ফুপুর বাড়িতে এমন চেহারা নিয়ে উঠা ঠিক হবে না জেনেও উঠলাম। এই বাড়ির বাথরুম খুব সুন্দর। হালকা নীল রঙের শ্রীলংকা টালি বসানো বাথরুম। বড় একটা বাথটাব আছে। বাথটাব পানি ভর্তি করে শুধু নাকটা ভাসিয়ে শুয়ে থাকা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তবে ও বাড়িতে উপস্থিত হবার বেশ কিছু সমস্যা আছে। বড় ফুপা ঘোষণা করে দিয়েছেন, আমাকে যেন তাঁর বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দেয়া না হয়। আমি একটি পাবলিক ন্যুইসেন্স। আমার আসল স্থান — মানসিক রুগীদের জন্যে নির্ধারিত কোন হোম। হোমে জায়গা পাওয়া না গেলে সেকেণ্ড চয়েস, মীরপুর চিড়িয়াখানা। আমার ফুপু তাঁর স্বামীর কোন বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন না, শুধু এই বক্তব্যে একমত। ফুপার বাড়িতে তারপরও মাসে দু'মাসে একবার যাই। ফুপার দুই ছেলেমেয়ে বাদল এবং রিনকি — এই দু'জনের কারণে। দু'জনই আমার মহাভক্ত। বাদলের ধারণা, আমি রাসপুটিন এবং গৌতম বুদ্ধের ফিফটি-ফিফটি মিকচার। শুধু মহাপুরুষ না, পরমপুরুষ। লোকজন এখনো আমাকে চিনতে পারছে না। যেদিন চিনবে, হৈ চৈ পড়ে যাবে। আমার সম্পর্কে রিনকির ধারণা অবশ্যি এত উচ্চ না। মেয়েরা সহজে কাউকে মহাপুরুষ ভাবে না। পুরুষের দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে তারা সবচে' ভাল জানে বলেই তারা অনায়াসে মহাপুরুষকেও সাধারণ পুরুষের দলে ফেলে দেয়।

বাদল বসার ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিল। আমাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠল। আনন্দিত স্বরে বলল, আরে হিমুদা ! কি যে সুন্দর তোমাকে লাগছে ! অদ্ভুত !

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আছিস কেমন?

বাদল সামাজিক সৌজন্যের ধার দিয়েও গেল না। মুগ্ধ স্বরে বলল, ভুরুও কামিয়ে ফেলেছ? ইস কি অদ্ভুত ! ভুরু কামানো মানুষ আমি এই প্রথম দেখলাম। সাদা চাদরে কি অপূর্বই না তোমাকে লাগছে হিমুদা !

'বাসায় লোকজন আছে?'

'সবাই আছে। দাঁড়াও ডাকছি। তুমি এক কাজ কর — সন্ন্যাসীদের মত সোফায় পদ্মাসন হয়ে বস। আমি সবাইকে ডাকি। বাবাও বাড়িতে আছেন, অফিসে যান নি। তাঁর পেটে ব্যথা।'

'তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেলো বাদল। পিস্তল বের করে আমাকে গুলি-টুলি করে দেয় কি-না কে জানে।'

'গুলি করবে কেন শুধু শুধু? আর যদি করেও তোমার কিচ্ছু হবে না। রাসপুটিনকে তিনবার গুলি করা হয়েছিল, পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ানো হয়েছিল, নদীর পানিতে চেপে ধরা হয়েছিল . . . তারপরেও . . . '

বাদলের কথা শেষ হবার আগেই ফুপু ঢুকলেন। আমাকে দেখে শুরুতে হকচকিয়ে গেলেও চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। পাথর হয়ে গেলেন। কর্কশ গলায় বললেন, তুই!

বাদল বলল, হিমুদাকে কি গ্রাণ্ড দেখাচ্ছে দেখলে মা? উফ অপূর্ব!

ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, এই নতুন ভং কবে ধরলি?

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। ফুপু বললেন, তোকে না এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কি মনে করে এলি?

'গোসল করতে এসেছি ফুপু। গোসল করেই বিদেয় হব। বাথটাবে সারা শরীর ডুবিয়ে . . . '

'পাগলের মত কথা বলিস না। তোকে আমাদের বাথরুমে ঢুকতে দেব?'

বাদল বলল, অফকোর্স দেবে মা। আমি বাথটাবে পানি দিচ্ছি। ডিপ ফ্রীজে বরফ আছে মা? বাথটাবে বরফের টুকরা ছেড়ে দেব। গ্রাণ্ড হবে।

ফুপু ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, তুই আমার সামনে থেকে যা বাদল, হিমুর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

'তুমি কথা বলতে থাক। আমি বাথটাব রেডি করি। বাথটাবটা আরেকটু বড় হলে আমিও তোমার সঙ্গে গোসল করে ফেলতাম।'

বাদল অত্যন্ত ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে গেল। ফুপু বললেন, তোকে যে পুলিশ খুঁজছে এটা কি তুই জানিস?

'না। আমি ঢাকায় ছিলাম না।'

'পুলিশ আমাদের এখানেও রোজ একবার করে তোর খোঁজে টেলিফোন করে। তুই না-কি কোন মন্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেছিস?'

'জ্বালানি মন্ত্রীর ছেলে?'

'কোন্ মন্ত্রী জানি না, তোর ফুপা জানে। সত্যি কিনা বল?'

'না।'

'না হলে খামাখা তোকে পুলিশ খুঁজবে কেন?'

'পুলিশ তো খামাখাই খোঁজাখুঁজি করে ফুপু।'

'তুই তোর ফুপার ঘরে যা। তার সঙ্গে কথা বল। কথা বলে বিদেয় হয়ে যা। এক মুহূর্তও এখানে থাকবি না।'

'গোসলটা করে ভদ্র হয়ে গেলে কেমন হয়?'

'এই বাড়িতে তোর গোসল হবে না। এক কথা কতবার বলব? যা, তোর ফুপার

ঘরে যা।'

ফুপা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছেন। টেবিলে বিরাট এক গ্লাস ভর্তি ঘোলাটে রঙের বস্তু। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, ওরস্যালাইন চালাচ্ছেন না-কি ফুপা?

ফুপা তিক্ত গলায় বললেন, ওরস্যালাইন না। ডাবের পানি।

'পেটব্যথা কমেছে কিছু?'

'আমার শরীর সম্পর্কে তোমার কৌতূহল দেখানোর কারণ দেখছি না।'

'ফুপু বলছিলেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমি কারো সঙ্গেই কথা বলতে চাই না। তোমার সঙ্গে তো নয়ই।'

'তাহলে ফুপা, যাই?'

'না বোস। তোমার ফুপু কি বলেছে যে পুলিশ তোমাকে খুঁজছে?'

'জ্বি, বলেছেন।'

'মন্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে না-কি ভেগেছ? করেছ কি? খুন করেছ?'

'না।'

'এখন না করলেও করবে। **You will end up in murder.** তুমি এক্ষুণি মন্ত্রীর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কর। এবং পুলিশকে বল আর যেন তারা টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত না করে।'

'আচ্ছা বলব। আমি কি এখন উঠতে পারি ফুপা?'

'হ্যাঁ উঠতে পার। আমি তোমাকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছিলাম, তারপরেও এসেছ?'

'গোসল করার জন্যে এসেছি। গোসল করেই চলে যাব।'

'গোসলের জন্যে বাথরুম খোঁজা তোমার শোভা পায় না হিমু। তুমি গোসল করবে ডোবায়, নর্দমায়। মানুষ স্নান করে পরিষ্কার হবার জন্যে, তুমি কর অপরিষ্কার হবার জন্যে। ভুল বললাম?'

আমি জবাব দিলাম না। ফুপাকে শান্ত করার একটা উপায় হচ্ছে তাঁর কোন প্রশ্নের জবাব না দেয়া। কথা বলতে বলতে তিনি এক সময় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে যান।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'তুমি নিজে একটা বদ্ধ উন্মাদ। তোমার দেখাদেখি আমার ছেলেটাও উন্মাদ হচ্ছে। মানুষ ভালটা কখনো শেখে না, মন্দটা শেখে। এই যে তুমি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করেছ — বাদল এই দেখে উৎসাহী হবে। আমি তোমার সঙ্গে একশ টাকা বাজি রাখতে পারি। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে। রাখতে চাও বাজি?'

'জ্বি না।'

'রাখতে চাও না কেন? টাকা নেই?'

'টাকার সমস্যা তো আছেই, তা ছাড়া এ বাড়িতে আপনার জিতে যাবার সম্ভাবনা। আমারো ধারণা, বাদল মাথা মুড়িয়ে ফেলবে, ভুরু কামিয়ে ফেলবে।'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, ভুরু কামাবে কেন?

'আমি কামিয়েছি তো, তাই।'

'তুমি ভুরু কামিয়েছ!'

'জ্বি।'

'I see. হিমু।'

'জ্বি।'

'আমি তোমাকে একটা প্রপোজাল দিচ্ছি। মন দিয়ে শোন। দিনে দশ টাকা হিসেবে প্রতি মাসে আমি তোমাকে তিনশ করে টাকা দেব। তার বদলে তুমি এ বাড়িতে আসবে না। রাজি আছ?'

'ভেবে দেখি।'

'আচ্ছা যাও ফাইভ হানড্রেড। প্রতি মাসের এক তারিখে আমি নিজে গিয়ে টাকাটা তোমার হাতে দিয়ে আসব। বাট ইউ গট টু প্রমিজ যে এই বাড়ির দু'হাজার গজের ভেতর তোমাকে দেখা যাবে না।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি তাহলে রাজি?'

'জ্বি রাজি।'

'প্রতিজ্ঞা করছ?'

'করছি।'

'আজ হচ্ছে মাসের কুড়ি তারিখ। তুমি দশদিনের টাকা পাবে। মাসে পাঁচশ হলে দশ দিনে হল ১৬৬ টাকা ৬৬ পয়সা।'

ফুপা মানিব্যাগ বের করলেন। টাকা বের করার আগেই বাদল ঢুকল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, ত্রিশটা টাকা দাও তো বাবা।

'কেন?'

'দুই কেজি বরফ আনব। দশ টাকা করে কেজি। দশটাকা রিকসা ভাড়া।'

'বরফ কি জন্যে?'

'হিমুদা বাথটাবে গোসল করবে। দুই কেজি বরফ এনে ছেড়ে দেব। ডিপ ফ্রীজে একদানা বরফ নেই।'

ফুপা কোন কথা না বলে বাদলের হাতে ত্রিশটা টাকা দিলেন এবং গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'কে বলবে তোমার সঙ্গে মেশার আগে আমার এই ছেলে বুদ্ধিমান ছিল?'

'বুদ্ধি এখনো আছে ফুপা।'

ফুপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বিড় বিড় করে বললেন, মানুষের ব্রেইন পুরোপুরি অকেজো করে দেয়ার ক্ষমতা কোন সহজ ক্ষমতা না। সবাই পারে না। তুমি পার।

'ওর ব্রেইন নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না ফুপা। ওর ব্রেইন ভাল।'

'ব্রেইন ভাল? ব্রেইন ভালর নমুনা শুনবে? গতমাসে কি করল শোন — বাড়ির পেছনে একটা সজনে গাছ আছে না? এক সন্ধ্যাবেলা দেখি সজনে গাছ জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দা থেকে দেখলাম। নিচে নেমে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? সে দাঁত বের করে বলল, গাছের ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছি। আমি বললাম, গাছের ইলেকট্রন নিয়ে নিচ্ছিস মানে? গাছের ইলেকট্রন নিতে তোকে কে বলেছে? সে চোখ বড় বড় করে বলল — হিমুদা শিখিয়েছে। এই ছেলের ব্রেইন তুমি ভাল বলবে? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি। তুমি কেন আমার এত বড় ক্ষতি করছ?'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, গাছের ইলেকট্রন নেয়ার ব্যাপারটা আপনাকে আরেকদিন বুঝিয়ে বলব। একবার বুঝিয়ে বললে আপনার কাছে আর তেমন হাস্যকর লাগবে না।

'আমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে না। তুমি বিদেয় হও। পাঁচশ টাকা দিচ্ছি, খুশি হয়েই দিচ্ছি। নিয়ে উধাও হয়ে যাও। দয়া করে বাদল বরফ নিয়ে ফিরে আসার আগেই যাও। ওর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ থাকলে — তোমার কাছ থেকে আরো কিছু কায়দা কানুন শিখে ফেলবে। এখন গাছ থেকে ইলেকট্রন নিচ্ছে, পরে হয়ত আগুন থেকে ইলেকট্রন নিতে চাইবে। একটাই আমার ছেলে হিমু, . . . ওনলি সান।'

'ঠিক আছে ফুপা আমি যাচ্ছি।'

'থ্যাংকস। মন্ত্রীর ছেলের ব্যাপারটা খোঁজ নিও। ওরা বড় বিরক্ত করছে।'

'আচ্ছা খোঁজ নেব।'

'ওসিকে বলবে আর যেন আমাদের বিরক্ত না করে। এক্ষুণি টেলিফোন করে বলে দাও — টেলিফোন নাম্বার তোমার ফুপুর কাছে আছে?'

'আছে ফুপা, এক্ষুণি টেলিফোন করছি।'

'এখান থেকে টেলিফোন করার দরকার নেই। কোন দোকান-টোকান থেকে কর। নাও, টেলিফোনের জন্যে পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও।'

গোসল না করেই ফুপার ঘর থেকে বের হলাম। ডাক্তারখানা থেকে ওসি সাহেবকে টেলিফোন করলাম। ভদ্রলোক হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন বলে মনে

হল। আনন্দে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তো তো করে তোতলালেন।

'কে বলছেন, হিমু সাহেব? ও মাই গড! আপনাকে আমরা পাগলের মত খুঁজছি। আপনি আত্মীয়স্বজনের যে লিস্ট দিয়ে গিয়েছিলেন সেই লিস্ট ধরে ধরে সবার কাছে গিয়েছি। যাদের টেলিফোন নাম্বার আছে তাদের অনবরত টেলিফান করছি।'

'কেন বলুন তো?'

'বিরাট সমস্যা হয়েছে ভাই। মোবারক হোসেন সাহেবের ছেলে — ঐ যে আপনার বন্ধু জহির — ও বাড়ি থেকে পালিয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি যত সহজে ও আচ্ছা বললেন ব্যাপারটা তত সহজ না। সারা শহর উলট-পালট করে ফেলা হয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে না। মোবারক সাহেবের ধারণা, আপনি তাকে ফুসলে-ফাসলে নিয়ে গেছেন, কিংবা আপনি জানেন সে কোথায় আছে।'

'আমি জানি না।'

'ভাই, আপনি জানেন কিংবা না জানেন, মোবারক হোসেন সাহেবের সঙ্গে আপনাকে একটু দেখা করতে হবে। এক্ষুণি।'

'এক্ষুণি তো যেতে পারব না। আমার এখনো গোসল হয় নি।'

'ভাই আমি সামান্য ওসি। ছোট চাকরি করি। আপনারা দু'জন এসে আমাকে মন্ত্রীর থাবার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। এখন উদ্ধার করুন।'

'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন? উনার শরীরের অবস্থা এখন কেমন?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, ঐদিন যদিও আপনি বলেছেন আপনার স্ত্রী সুস্থ আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা, তিনি বেশ অসুস্থ। আমার ইনট্যুসন পাওয়ার খুব প্রবল। সব সময় তা কাজ করে না। মাঝে মাঝে করে। এখনো করছে। এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি — এখনো মনে হচ্ছে তিনি খুব অসুস্থ।

ওসি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ সে অসুস্থ। তাঁর অসুখ সারাবার সাধ্য কারোর নেই। আপনার থাকলেও থাকতে পারে। এটা বড় ব্যাপার না, এই মুহূর্তে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখন আপনি আমাকে দয়া করে উদ্ধার করুন। প্লীজ, ঐ বাড়িতে যান।

'এখন গেলে তো উনাকে পাওয়া যাবে না। মন্ত্রী সাহেব বিকেলে ফিরে ঘণ্টা খানেক ঘুমান, তারপর আবার বের হন। ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা।'

'উনি না থাকলেও উনার স্ত্রী আছেন। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। ভাই, আপনি কি যাবেন?'

'যাচ্ছি।'

'সত্যি যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ সত্যি যাচ্ছি।'

'ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি না জেনে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন।'

'ক্ষমা করে দিলাম। আপনার স্ত্রীর অসুখটা কি?'

'ওর গলায় ক্যানসার। মাসখানিক আয়ু আছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি ক্যানসার সারাতে পারেন?'

'না।'

'তাও ভাল স্বীকার করলেন। সবাই বলে সারাতে পারে। হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা বলে পারে, কবিরাজ বলে পারে, পীর-ফকির বলে পারে।'

'আপনার স্ত্রীর নাম কি রানু?'

'তাকে চেনেন?'

'চিনি না, হঠাৎ মনে হল তাঁর নাম রানু। তাঁর মাথা ভর্তি চুল।'

ওসি সাহেব জবাবে হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

জহিরদের বাড়িতে তেমন কোন ঝামেলা ছাড়াই ঢুকলাম। জহিরের মা সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রমহিলা দেখতে অবিকল তিতলীর মত। যেন মা'র মাথাটা কেটে তিতলীর ঘাড়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মা-মেয়ের চেহারায় এত মিল সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে দু'জনের তাকানোর ভঙ্গি দু'রকম। মা শান্ত চোখে আমাকে দেখছেন। মেয়ের চোখে তীব্র রাগ এবং ঘৃণা। এমনভাবে আমাকে দেখছে যেন মাটির নিচ থেকে অদ্ভুত জন্তু বের হয়ে এসেছে। মেয়েই প্রথম কথা বলল, আমার ভাই কোথায়?

'জানি না কোথায়।'

'দয়া করে মিথ্যা বলবেন না। আপনি যথেষ্ট যন্ত্রণা করেছেন। আমরা আর যন্ত্রণা সহ্য করব না।'

জহিরের মা বললেন, তিতলী তুই চুপ কর তো। চুপ করে বসে থাক। যা বলার আমি বলব। বাবা, তুমি কি সত্যি জান না ও কোথায়?

'সত্যি জানি না।'

'কোথায় থাকতে পারে তা কি জান?'

'না, তাও জানি না।'

'কিছু মনে করো না বাবা। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি জান। জেনেও বলছ জানি না।'

'এ রকম মনে হবার কারণ কি?'

'ও একটা চিঠি লিখে গেছে। চিঠি থেকে মনে হচ্ছে তুমি জান। তিতলী চিঠিটা এনে একে দেখা।'

'চিঠি দেখাতে হবে না মা। ব্যক্তিগত চিঠি বাইরের মানুষকে দেখানোর দরকার কি?'

'ও বাইরের মানুষ না, ও জহিরের বন্ধু। তুই চিঠি নিয়ে আয়।'

তিতলী চিঠি আনতে গেল। ভদ্রমহিলা কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁকে খুবই কাহিল দেখাচ্ছে। চোখ লাল। মনে হয় রাতে ঘুমটুম হচ্ছে না।

'বাবা, তোমার নামটা যেন কি?'

'হিমু।'

'ও হ্যাঁ হিমু। জহির কি তোমার খুব ভাল বন্ধু?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সেটা জহির বলতে পারবে। আমি তো বলতে পারব না। আমি জহিরকে খুব পছন্দ করি — এইটুকু বলতে পারি।'

'কেন পছন্দ কর?'

'ভাল ছেলে। সরল সাদাসিধা। মনটা গভীর দিঘির জলের মত স্বচ্ছ।'

ভদ্রমহিলা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মেয়েকে আসতে দেখে চুপ করে গেলেন। তিতলী আমার সামনে চিঠি রাখল। তার ফর্সা মুখ এখনো ঘৃণায় কুঁচকে আছে। তিতলীর মা ক্লান্ত গলায় বললেন,

'বাবা, চিঠিটা পড়। তুমি কি দুপুরের খাওয়া সেরে এসেছ?'

'না।'

'তাহলে এখানেই খাবে। জহিরের বাবা তিনটার দিকে আসবেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে তারপর যাবে।'

'এখানে তো আমি খেতে পারব না। গোসল না করে আমি কিছু খেতে পারি না। সাতদিন আমি আছি গোসল ছাড়া।'

তিতলী বলল, আপনাকে সেটা বড় গলায় বলতে হবে না। আপনার গা থেকে যে বিকট গন্ধ আসছে তা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি।

মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম কঠিন গলায় বললেন, তিতলী, তুই ভেতরে যা। এই ছেলে এখানে খাবে। ওর গোসলের ব্যবস্থা করতে বল। বাথরুমে তোয়ালে সাবান দাও।

তিতলী উঠে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — বাবা, তুমি আমার ছেলে প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলেছ সেগুলি আমার এই মেয়ে প্রসঙ্গেও সত্য। আমার এই মেয়ের মনটাও গভীর দিঘির জলের মত স্বচ্ছ। ও তোমার উপর রেগে আছে বলে এরকম করছে। ওর ধারণা . . . .

ভদ্রমহিলা কথা শেষ করলেন না। সম্ভবত মেয়ের ধারণার কথা তিনি আমাকে বলতে চান না। আমি জহিরের চিঠি পড়তে শুরু করলাম। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। তবে বোনকে লেখা, তা বোঝা যাচ্ছে।

আমার এই চিঠি পড়ে খুব রাগ করবি। একবার ভেবেছিলাম চিঠি লিখব না। তাতে সবাই দুঃশ্চিন্তা বেশি করবে। তাই এই চিঠি। তোদের সঙ্গে আমি থাকতে পারছি না। মানুষ হিসেবে বাবা অত্যন্ত নিম্নমানের। তিনি অনর্গল মিথ্যা বলেন। একের পর এক আজে বাজে কাজ করে যান। কিছু কিছু কাজ এমন যে, শয়তানের পক্ষেও করা সহজসাধ্য না। উদাহরণ দেই — আমাদের গ্রামের বাড়ির বুলু মাস্টার। ভদ্রলোক নিতান্তই ভাল মানুষ। তাঁর অপরাধের মধ্যে অপরাধ হচ্ছে, ইলেকসনের সময় বাবার বিরুদ্ধে নানান কথা বলেছে যেন লোকজন বাবাকে ভোট না দেয়। সে যেসমস্ত কথা বলেছে তার প্রতিটি বাক্য সত্য। যাই হোক। বাবা তাঁকে খুনের মামলায় এমন ফাঁসানো ফাসিয়েছেন যে এক ধাক্কায় যাবজ্জীবন হয়ে গেল। এই জাতীয় মানুষের সঙ্গে কি বাস করা যায়? তুই-ই বল। মা'ও যে বাবার চেয়ে আলাদা, তা না। বাবার প্রতিটি অন্যায় মা সমর্থন করে যাচ্ছেন। আদর্শ স্বামীর আদর্শ স্ত্রী। বাবাকে একবার তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে গেল। টাকাটা দিয়ে গেল মা'র হাতে। মা শান্ত ভঙ্গিতে সেই টাকা আয়রণ সেফে তুলে রাখলেন। তাঁর মধ্যে কোন বিকার নেই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাব জানি না। গর্ত খুঁড়ে মাটিতে ঢুকে থাকতে ইচ্ছা করছে। ভাল কথা, ঐ রাতে হিমুর সঙ্গে গর্ত খুঁড়ে বসেছিলাম — দারুণ লাগছিল। দু'জনই থানায় গেলাম, বাবা আমাকে ছাড়িয়ে আনলেন, হিমুকে আনলেন না। বেচারা একা বসে রইল। পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে মারধোরও করেছে। বাবা সেরকম ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন। অবশ্য এতে হিমুর কিছুই যাবে আসবে না। পুলিশের পক্ষে ওকে হজম করা মুশকিল। ও কঠিন চিজ।

তুই ভাল থাকিস। প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাক যাতে তুইও বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারিস। বাঁচার পথ একটাই। তোর ড্রয়ার থেকে কিছু টাকা নিয়ে গেলাম। একেবারে খালি হাতে বের হতে সাহস পাচ্ছি না।

'বাবা চিঠি পড়লে?'

'জ্বি পড়লাম।'

'কিছু বলবে?'

'ও কত টাকা নিয়েছে?'

'সাতশ' তেত্রিশ টাকা।'

'চিন্তার কোন কারণ দেখি না। টাকা শেষ হলেই ফিরে আসবে। আগেও তো অনেকবার পালিয়েছে। নতুন কিছু তো না।'

জহিরের বাবাও তাই বলেছেন। কিন্তু আমি ভরসা পাচ্ছি না। রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। ঐ দিন দেখলাম . . .

তিতলী বলল, গোসলের পানি দেয়া হয়েছে, আপনি আসুন। মেয়েটা এখনো চোখে-মুখে ঘৃণা ধরে আছে। ভালবাসা অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়, ঘৃণা যায় না। এই

মেয়েটা কি করে ধরে রেখেছে সে-ই জানে।

'কি হল, বসে আছেন কেন? আসুন।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলাম এবং বাথরুমে ঢোকার আগে থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাদের বাথরুমে কি বাথটাব আছে?

'হ্যাঁ আছে।'

'তাহলে দয়া করে দু'কেজি বরফের ব্যবস্থা করুন। বাথটাবে পানি দিয়ে আমি তার মধ্যে দু'কেজি বরফ ছেড়ে দেব। তারপর নাক ভাসিয়ে শুয়ে থাকব।'

'পাগলামী কথাবার্তা আমার সঙ্গে বলবেন না। পাগলামী কথা শুনে আমি মুগ্ধ হই না। আমি জহির না।'

'আপনাদের ডীপ ফ্রীজে বরফ নেই?'

তিতলী জবাব দিল না। আমি জবাব আশাও করিনি।

মন্ত্রীর বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন প্রচুর থাকবে এটা ভাবাই স্বাভাবিক। বিশাল ডাইনিং টেবিল থাকবে। চায়নীজ রেস্টুরেন্টের মত উর্দিপরা বয় থাকবে। ন্যাপকিন-কাটাচামচ থাকবে। সে রকম কিছু না। খেতে এসে দেখি খুবই এলেবেলে ব্যবস্থা। খাবার টেবিলটা ছোট। টেবিল ক্লথে তরকারির দাগ লেগে আছে। উর্দিপরা বয় বাবুর্চি দেখলাম না — বৃদ্ধা এক কাজের মেয়েকে দেখলাম তিতলী যাকে বড় বুবু করে ডাকছে। আয়োজন সামান্য — রুগ্ন ধরনের কই মাছ, মুরগীর মাংস, ডাল এবং কালচে ধরনের পেপেভাজি।

তিতলী কঠিন ভঙ্গিতে বলল, খেতে বসুন।

'আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?'

'খাওয়া না হলেও আপনার সঙ্গে বসে খাব এরকম ভাবছেন কেন?'

'ভাবছি না।'

'না ভাবলেই ভাল, বড়বুবু আছেন কিছু লাগলে উনাকে বলবেন, উনি দেবেন। আমি এসেছি শুধু আপনাকে একটা খবর দেবার জন্যে।

'কি খবর?'

'আপনি যে এসেছেন বাবাকে বলা হয়েছে। বাবা একটা কেবিনেট মিটিংএ আটকা পড়েছেন! আসতে রাত হবে। বাবার সঙ্গে দেখা না করে আপনি যাবেন না। খাওয়া শেষ হলে বড় বুবু আপনাকে ভাইয়ার ঘরে নিয়ে যাবে। আপনি ঐ ঘরে বিশ্রাম করবেন।'

'হাউস এ্যারেস্ট?'

'ভাইয়া চিঠিতে লিখেছে কেউ আপনাকে হজম করতে পারে না। আমরা পারব কেন? আপনাকে থাকতে বলা হয়েছে, আপনি থাকবেন।'

'ঠিক আছে থাকব। তুমি বস, খেতে খেতে গল্প করি। আমার সঙ্গে গল্প করবে? আমি অনেক হাসির গল্প জানি।'

'আপনার সঙ্গে গল্প করব মানে? হু আর ইউ? তাছাড়া তুমি করে বলছেন কেন? বাংলা সিনেমা পেয়েছেন? সব জায়গায় ভড়ং চলে না। মনে রাখবেন।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তিতলী তুমি গল্প করতে না চাও করবে না। চেঁচামেচি করছ কেন? কেউ খাওয়ার সময় চেঁচামেচি করলে আমি খেতে পারি না। হাজার হলেও আমি তোমাদের অতিথি। তাছাড়া খাবার আয়োজনও ভাল না। গল্পগুজব না করলে এইসব খাবার আরো বিস্বাদ লাগে।

'তুমি তুমি করে কেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন? এই অধিকার আপনাকে কে দিল? এত সাহস আপনি কোত্থেকে পাচ্ছেন? আমি আপনাকে একটা শিক্ষা দেব। এমন শিক্ষা দেব যে আপনি কোনদিন ভুলবেন না।'

জহিরের মা এই পর্যায়ে খাবার ঘরে ঢুকে বললেন, কি হয়েছে?

তিতলী বলল, কিছু না।

জহিরের মা বললেন, বাবা তোমাকে রাত এগারোটা পর্যন্ত থাকতে হবে। তোমাকে কি তিতলী এই কথা বলেছে?

'বলেছে। আমার কোন অসুবিধা নেই।'

'খেতে পারছ বাবা?'

'আমাকে এত ঘন ঘন বাবা বলবেন না। আমার খুব অস্বস্তি লাগে।'

'তোমার মা যখন বলেন তখনো কি অস্বস্থি লাগে?'

'মা বলার সুযোগ পান নি। মা বললেও লাগতো বলেই আমার ধারণা।'

রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। মোবারক হোসেন সাহেব ন'টার দিকে বাসায় ফিরলেন। আমার ডাক পড়ল দশটায়। দোতলা পেছনের দিকের বারান্দায় তিনি বসে আছেন। বসে না, ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় আছেন । পা দু'টা মোড়ার উপর। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত তোলা এক লুঙ্গি কোন রকমে কোমরে জড়ানো। তিতলী আমাকে নিয়ে গেল। তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, বোস।

হাতলবিহীন একটা চেয়ার রাখা হয়েছে আমার জন্যে। আমি বসলাম। তিনি আবারো হাই তুলতে তুলতে তিতলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘরে টক দৈ আছে কি-না দেখতো মা। থাকলে আমাকে এক বাটি দিয়ে যাও।

তিতলী চলে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। আমার সঙ্গে কথা বলার কোন রকম আগ্রহ দেখলাম না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। তবে মোড়ায় রাখা পা নড়ছে। তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে ভদ্রলোক জেগেই আছেন।

'হিমু !'

'জ্বি স্যার !'

'প্রথমেই তোমার একটা ভুল ধারণা ভাঙ্গানো দরকার। আমার স্ত্রী এবং কন্যার আচার আচরণে তোমার হয়ত ধারণা হয়েছে জহিরের পালিয়ে যাবার ব্যাপারটায় আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। ব্যাপারটা মোটেই তা না। এটা নতুন কোন ঘটনা না। এ জাতীয় ঘটনা আগেও ঘটেছে। আমি বরং খুশি যে সে বাড়ি থেকে বিদেয় হয়েছে। তোমাদের বাংলায় একটা প্রবচন আছে না — দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল ?'

'উল্টা প্রবচনও আছে স্যার, 'নাই গরুর চেয়ে কানা গরু ভাল'। অবশ্যি প্রবচনটা একটু অন্যভাবে আছে — নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। মূল ভাব কিন্তু এক।'

'হিমু !'

'জ্বি স্যার।'

'আমার চেহারায় কোথায় যেন একটু বোকা ভাব আছে। যার সঙ্গেই কথা বলি সেই আমাকে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করে। যদিও আমি মানুষটা বোকা না। একটা বোকা লোক সব সরকারের আমলে মন্ত্রী হয় না। এক সরকারের আমলে হয় অন্য সরকারের আমলে জেলে চলে যায়। আমি এখনও জেলে যাইনি।

'আপনি বুদ্ধিমান এই নিয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'বুদ্ধিমান মানুষ আবার নানা ধরনের আছে। কিছু মানুষ আছে যারা বড় সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমান, আবার ক্ষুদ্র সমস্যার ব্যাপারে না। আমি ছোট এবং আপাতত তুচ্ছ বিষয়েও বুদ্ধিমান। প্রমাণ চাও?'

'আমি চাচ্ছি না। আপনি দিতে চাইলে দিতে পারেন।'

'বেশ প্রমাণ দিচ্ছি। তোমাকে নিয়ে আমার মেয়ে উপস্থিত হল। আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের কথাবার্তায় সে থাকুক। তাকে চলে যেতেও বলতে চাইলাম না, কারণ তাতে তার ধারণা হতে পারে আমি তোমার সঙ্গে জরুরী কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছি। কাজেই তাকে টক দৈ আনতে বললাম। আমি জানি ঘরে টক দৈ নেই। দোকান থেকে আনতে হবে। এতে খুব কম করে হলেও আধ ঘণ্টা সময় লাগবে। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আধ ঘণ্টা যথেষ্ট। আশা করি প্রমাণ পেয়েছ যে আমি বুদ্ধিমান।'

'জ্বি পেয়েছি। বলুন কি বলবেন।'

'আমার স্ত্রীর কাছ থেকে শুনলাম জহিরের চিঠি তুমি পড়েছ। যে ছেলে নিজের বাবা-মা সম্পর্কে এত কুৎসিত কথা লিখতে পারে তার বাড়িতে থাকার এমনিতেই কোন অধিকার নেই। সে চলে গেছে ভাল করেছে। গুড ফর হিম। আমার সম্পর্কে

যে সব অভিযোগ এনেছে তার প্রত্যেকটার জবাব দেয়া যায়। কী জবাব দেব তুমি কি শুনতে চাও?'

'না।'

'শুধু একটার জবাব দিচ্ছি — বুলু মাস্টারের ব্যাপারটা। লোকটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। স্কুল টিচার, তার কাজ হচ্ছে ছাত্র পড়ানো। করে পলেটিক্স। সারাক্ষণ আমার বিরুদ্ধে লেগে ছিল। ইচ্ছা করলেই হারামজাদাকে আমি দশ হাত পানির নিচে পুঁতে ফেলতে পারতাম। তা করিনি। আমি মন্ত্রী হয়ে যাবার পর স্থানীয় লোকজন আমাকে খুশি করবার জন্যে তাকে খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলল। খেয়াল রাখবে আমি কাউকে কিছু করতে বলিনি। ওসি আমাকে খুশি করতে চাইল, স্থানীয় মেম্বার–চেয়ারম্যান খুশি করতে চাইল, একদল মিথ্যা সাক্ষী জুটে গেল। একদল অসৎ লোক মিলে কাণ্ডটা করল।'

'আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি সহজে খুশি হই না, সহজে ,ব্যাজারও হই না। আমার পুত্র এইসব ব্যাপার জানে না। সে জানে আমি শয়তান ধরনের মানুষ। ভাল কথা। ছেলে উপযুক্ত হয়েছে সে তার নিজস্ব ধারণা করতেই পারে — ছেলের ব্যাপারে আমার মোটেই মাথাব্যথা নেই। আমি তোমার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছি।'

মোবারক হোসেন সাহেব এই প্রথম চোখ মেললেন। আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। আমি খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, আমার কি ব্যাপার জানতে চান?

'সব কিছুই জানতে চাই। আমি কিছু খোঁজ–খবর করিয়েছি। এখনো করছি। তোমার উদ্দেশ্যটা কি? জহিরকে গর্ত খুঁড়ে বসিয়ে রাখার কাজটা যে তুমি করেছ, আমার ধারণা তা খুব ভেবে চিন্তে করেছ। এর পেছনে তোমার পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনাটা কি? চট করে জবাব দিতে হবে না। ভাব। ভেবে ভেবে জবাব দাও।'

আমি চুপ করে রইলাম। মোবারক হোসেন সাহেব চাপা গলায় বললেন, তুমি কি নিজেকে মহাপুরুষ মনে কর?

'না।'

'অনেকেই মনে করে।'

'কেউ কেউ করে।'

'অনেকের ধারণা তোমার সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে। যে ওসি তোমাদের ধরে থানায় নিয়ে গিয়েছিল তাঁরও ধারণা সে রকম। তোমার কি আছে কোন সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা?'

'না। তবে আমার ইনট্যুশন ক্ষমতা প্রবল। মাঝে মাঝে দু' একটা কথা বলে ফেলতে পারি।'

'সে তো সবাই পারে। তোমার ইনট্যুশন এই মুহূর্তে কি বলছে?'

'এই মুহূর্তে আমার ইনট্যুশন বলছে আপনি বড় রকমের ঝামেলায় পড়েছেন। এখন আর তেল এবং জ্বালানি মন্ত্রী না।'

মোবারক হোসেন শীতল গলায় বললেন, তোমার ইনট্যুশন ক্ষমতা কিছুটা হয়ত আছে, কিন্তু বলা যায় অনুমান শক্তি প্রবল। ব্যাপারটা ঘটেছে আজ রাত আটটায়, তোমার জানার কথা না। প্রেসিডেন্টের গুডবুক থেকে নাম কাটা গেছে, গুড বুক থেকে নাম কাটা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাড বুকে নাম উঠে যায়। সেখানে নাম উঠে গেছে। আমাকে জেলে যেতে হতে পারে। তোমার ইনট্যুশন কি বলে?

'আমার ইনট্যুশন কিছু বলছে না।'

মোবারক হোসেন আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মোড়ায় রাখা তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল কাঁপতে লাগল। মনে হয় এই হল তাঁর চিন্তার পদ্ধতি।

'হিমু!'

'জ্বি স্যার।'

'আমাকে জেলে ঢুকানো সহজ না। এতে থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে। আমাকে অখুশি করাও বর্তমান সরকারের পক্ষে খুব রিস্কি।' মেরে ফেললে ভিন্ন কথা। তোমার ইনট্যুশন কি বলে?'

'কিছু বলছে না।'

'তোমাকে ডেকে আনার কারণ এখন বলি, ভাল কথা, তুমি নিজে কি কিছু আন্দাজ করতে পারছ?'

'না।'

'কথা বলার জন্য ডাকলাম আর কিছু না। একটা পর্যায় আছে যখন কথা বলার কেউ আশেপাশে থাকে না। আমার অনেক কথা আছে। বলার মানুষ নেই। জহিরের বিষয় নিয়ে মাথাব্যথা নেই। লেট হিম গো টু হেল। অবশ্য গেছেও তাই। কোথায় আছে সেই খোঁজ বের করা আমার পক্ষে কঠিন না। বের করতে চাচ্ছি না। আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ, তুমি আমার সঙ্গে একধরনের খেলা খেলার চেষ্টা করছ। ভাল কথা, খেল। শুধু জানিয়ে রাখলাম — যে খেলাটা তুমি গোপনে খেলতে পারছ না। আমি জানি।'

তিতলী টক দৈয়ের বাটি নিয়ে ঢুকল। আমি বললাম, চাচা আমি কি এখন যেতে পারি?

'অবশ্যই যেতে পার। তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়নি। গুড নাইট।'

৪

ঘুম ভেঙ্গে কেউ যদি দেখে তার মুখের ঠিক ছ'ইঞ্চি উপর একটি অচেনা মেয়ের মুখ ঝুঁকে আছে, যার চোখ টানা টানা, বয়স অল্প, তাহলে তার ছোটখাট একটা ধাক্কা খাওয়ার কথা। আমি তাই খেলাম। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড মাথা ফাঁকা হয়ে থাকল। তরপর শুনলাম, অচেনা মেয়েটি বলছে — 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না। কোন মেয়ে যদি জিজ্ঞেস করে আপনি আমাকে চিনতে পারছেন, তাহলে তার মুখের উপর না বলা যায় না। কেউ বললে আদালতে তার জেল জরিমানা দুই-ই হবার বিধান থাকা উচিত।

'চিনতে পারছেন তো আমাকে? এর আগে দু'বার দেখা হয়েছে। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারিনি। দাড়ি গোঁফ কেটে ফেলছেন কেন? আপনাকে সুন্দর লাগতো। আমি ঘরে ঢুকে প্রথম একটু চমকে গেলাম। ভাবলাম, কার না কার ঘরে ঢুকেছি। আচ্ছা, আপনি এমন দরজা খোলা রেখে ঘুমান? চোর এলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত।'

আমি মেয়েটিকে চিনলাম। কথা বলার ভঙ্গি থেকে চিনলাম। এই মেয়ে একনাগাড়ে কথা বলছে। খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলছে। আমার চেনার মধ্যে এরকম আন্তরিক ভঙ্গিতে একজনই কথা বলে — রফিকের বউ। কিন্তু রফিকের বউয়ের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল — এই মেয়েটিকে দারুণ রোগা লাগছে।

'আমি কতক্ষণ আগে এসেছি বলুন তো? কাঁটায় কাঁটায় দেড় ঘন্টা। বেশ কয়েকবার আপনার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেছি। দরজায় ঠক ঠক করেছি, খক খক করে কেশেছি। দিনের বেলায় কারো এমন গাঢ় ঘুম হয় আমি জানতাম না। শেষে কি হল জানেন? একটু ভয় লাগতে লাগল।'

'কিসের ভয়?'

'হঠাৎ মনে হল কেউ এসে হয়ত আপনাকে খুনটুন করে গেছে। দরজা খোলা তো, তাই এ রকম মনে হল। নিঃশ্বাস পড়ছে কি-না দেখার জন্যে আপনার মুখের উপর ঝুঁকে ছিলাম।'

আমি উঠে বসতে বসতে বললাম, রফিক ভাল?

•'সেটাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন কেন? আপনি জানেন না? দেখা হয় না?'

'রোজই দেখা হয়। ও রোজ একবার করে আসে। ঠিক সন্ধ্যার দিকে আসে। ভাইয়ার বসার ঘরে ঘন্টাখানিক বসে থেকে চলে আসে।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয় না?'

'না। ভাইয়া আমাকে বলে দিয়েছে আমি যেন কথা না বলি। তারপরেও বলতাম। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার ভাইয়া বাসায় থাকে।'

'আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন? চেয়ারটায় বসুন।'

'আমার নাম কি আপনার মনে আছে?'

'মনে আছে। আপনার নাম যূথী।'

'অনেকে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে যূথী লেখে। আমিও আগে লেখতাম। এখন লিখি না। আচ্ছা শুনুন, আপনার একটা চিঠি এসেছে। নিচে পড়ে ছিল, আমি টেবিলে রেখে দিয়েছি। নিন।'

'চিঠি পরে পড়ব। এমন কিছু জরুরী চিঠি না। আমার বাড়ির চিঠি। প্রতি মাসের শেষের দিকে তাঁরা একটা চিঠি পাঠান।'

'আপনি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ভদ্র হয়ে আসুন — কথা বলি। আপনার সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে। আর শুনুন, আপনার এখানে চা পাওয়া যায়?

আমি-হাত মুখ ধুয়ে, শার্ট গায়ে দিয়ে, ঘরে ঢুকলাম। যূথী খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। যেন এটা তারই বাড়িঘর। আমি চৌকিতে বসতে বসতে বললাম, বলুন কি ব্যাপার?

'আপনার বন্ধুর চাকরির কি কিছু হয়েছে? ভাইয়া ওকে জিজ্ঞেস করছিল। ও বলল — হিমুকে বলেছি। হিমু সব ঠিক করে দেবে। ভাইয়ার ধারণা ও কাউকেই কিছু বলেনি।'

'আমাকে বলেছে।'

'আমি জানি বলেছেন। ও কখনো মিথ্যা কথা বলে না। আমি ভাইয়াকে সেটা বললাম, ভাইয়া আমার উপর রেগে গেলো। ভাইয়া ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। বলে সাব-হিউমেন স্পেসিস। ভাইয়া বলে — ওর শুধু চেহারাটা আছে। কোল বালিশের খোলটা শুধু ঘুরে, ভেতরে বালিশ নেই।

'আপনার ভাইয়া কি রফিকের চাকরির কোন চেষ্টা করছেন না?'

'না। করবেও না। বললাম না ওকে দেখতে পারে না। ওর নাম শুনলেও রেগে যায়। তার উপর এখন বলছে — ওকে ডিভোর্স দিতে।'

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ। এটা আপনাকে বলার জন্যই এসেছি। ভাইয়ার বাসায় ওকে কেউ দেখতে পারে না। আমার ভাবী বলছিল — যূথী, তুমি যে ঐ ছেলের সঙ্গে থাকতে চাও — ওর তো মাথা খারাপ। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। কোন সুস্থ ছেলে এই কাজ করবে না। একদিন দেখবে ঘুমের মধ্যে তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। তার পর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়িতে ঝুলিয়ে বলবে আত্মহত্যা। পাগলদের বাস্তব বুদ্ধি আবার ভাল থাকে। আমি ভাবীর কথায় গুরুত্ব দেই নি — এখন আপনি বলুন, দিনের পর দিন কেউ যদি কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে — ডিভোর্স দাও, ডিভোর্স দাও, তাহলে কি ভাল লাগে?'

'ভাল লাগার তো কথা না।'

'আচ্ছা আপনি কি ওর চাকরির কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'পারব।'

'সত্যি পারবেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে একটু তাড়াতাড়ি করবেন। ও চাকরি পেলেই আমি ওর কাছে চলে যাব। তখন আর ভাইয়া বলতে পারবে না — চাকরি-বাকরি নেই। ও তোকে খাওয়াবে কি? আজ তাহলে উঠি।'

যূথী ঝট করে উঠে দাঁড়াল। আর তখনি আমার মনে হল ঐ মেয়েটা রূপার মত। যদিও এরকম মনে হবার কোন কারণ নেই। আমরা পছন্দের মানুষদের মধ্যে অতি প্রিয়জনদের ছায়া দেখি। এটাই মূল ব্যাপার।

'হিমু ভাই, আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিন। আসার সময় দেখেছি কতগুলো বখা ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমায় দেখে একজন বলল, শুঁটকি রাণী, শুঁটকি রাণী।'

আমি যূথীকে রিকশায় উঠিয়ে দিয়ে আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আজ আমার পরিকল্পনা সারাদিন ঘুমানো। সাইকেলটা বদলে দেয়া। সারাদিন ঘুমুব, রাতে জেগে থাকব। আমার বাবার অনেক উপদেশের একটি হচ্ছে —

"ঘুমাইয়া রাত নষ্ট করিও না। দিনে নিদ্রা যাইবে। রাত কাটাইবে অনিদ্রায়। কারণ রাত্রি আত্ম-অনুসন্ধানের জন্য উত্তম। জগতের সকল পশু নিশিযাপন করে। পশু মাত্রই নিশাচর। মানুষ এক অর্থে পশু। নিশিযাপন তার অবশ্যকর্তব্যের একটি।"

বিছানায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করার পরও ঘুম আনা গেল না। ঘরে খবরের কাগজ নেই, পুরানো ম্যাগাজিন নেই যে চোখ বুলাব। মামার বাড়ি থেকে আসা চিঠিটা অবশ্যি পড়া যায়, পড়তে ইচ্ছে করছে না। চিঠিতে কি লেখা না পড়েই বলে দিতে পারি। একই ভাষায়, একই ভঙ্গিতে একটি শব্দ এদিক-ওদিক না করে ছোট মামা দীর্ঘ দিন ধরে চিঠি লিখছেন। চিঠির মাথায় আরবীতে লেখা থাকে ইয়া রব। তারপর গুটি গুটি হরফে লেখেন —

দোয়া গো,

পর সমাচর এই যে, দীর্ঘদিন তোমার কোন পত্রাদি না পাইয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত আছি। আশা করি আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন তোমাকে সুস্থ দেহে রাখিয়াছেন। আমাদের এদিকের সংবাদাদি মঙ্গল। তুমি কোন চিন্তা করিবে না। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় এইবার ফসল ভাল হইয়াছে। ব্যবসাপাতিও ভাল। তোমাকে মাসিক যে টাকা পাঠানো হয় তাহাতে তোমার খরচ চলে কিনা জানি না। প্রয়োজন হইলেই জানাইবা। এই বিষয়ে কোন রকম লজ্জা বা সংকোচ করিবে না। তোমাকে যে কি পরিমাণ স্নেহ করি তাহা একমাত্র আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন জ্ঞাত আছেন।

শরীরের যত্ন নিবা। পথে পথে ঘোরার অভ্যাস ত্যাগ করিবা। মনে রাখিও, ভিক্ষুকরাই পথে পথে ঘুরে। তুমি ভিক্ষুক নও। কারণ আমরা এখনও জীবিত আছি। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় তোমার অন্নের অভাব কখনো হইবে না। কোন কারণে আমার মৃত্যু ঘটিলেও চিন্তাযুক্ত হইও না। কারণ আমি তোমার নামে আলাদা সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া দিয়া রাখিয়াছি। তাহাতে কেহ হাত দিবে না। দোয়া নিও। ইতি তোমার ছোট মামা।

বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে মনে হল — অনেকদিন মামার বাড়ি যাওয়া হয় না। কোন এক গভীর রাতে হঠাৎ উপস্থিত হলে কেমন হয়?

চার বছর আগে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। ঠাকরোকোণা স্টেশনে নেমে সাত মাইল হেঁটে রাত একটার সময় উপস্থিত হলাম। ছোট মামা ঘুম ভেঙে উঠে এলেন। প্রথমে খানিকক্ষণ হতভম্ভ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আনন্দে কেঁদে ফেললেন। গোসলের জন্যে গরম পানি করা হল। মামা গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন। মুরগী জবেহ করে যেন পোলাও কোরমা করা হয়। রান্না হতে হতে রাত তিনটা বেজে গেল। মামা বললেন, ছেলেটা একা একা খাবে না-কি — দেখি ওর সাথে আমাকেও দাও।

মাঝের ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা। সেই ঘরের খাট মামার পছন্দ না। খাট খুলে নতুন খাট পাতা হল। বিশাল খাট। জানা গেল, এই নতুন খাট আমার জন্যেই মামা বানিয়ে রেখেছেন। একজন মানুষের প্রতি অন্য একজনের ভালবাসা যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে আমার মামাদের না দেখলে আমি তা জানতে পারতাম না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষ হিসেবে মামারা পিশাচ শ্রেণীর! তাঁদের সমস্ত ভালবাসা নিজের মানুষদের জন্যে, বাইরের কারোর জন্যে নয়।

মামার বাড়িতে সেবার দু'মাস কাটিয়ে দিলাম। তারপরেও যখন চলে আসার জন্যে ব্যাগ গুটাচ্ছি, ছোট মামা দুঃখিত গলায় বললেন, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি? আর দু'টা দিন থেকে যা, সিঁদুরে গাছের আমগুলি পাকুক। তোকে যেতে দিতে ইচ্ছা করে না রে হিমু। ইচ্ছে করে মোটা একটা শিকল দিয়ে তোকে বেঁধে রাখি।

৫

"শিকল দিয়ে কাউকেই বেঁধে রাখা হয় না। তারপরেও সব মানুষই কোন না কোন সময় অনুভব করে তার হাতে-পায়ে কঠিন শিকল। শিকল ভাঙতে গিয়ে সংসার-বিরাগী গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে। ভাবে, মুক্তি পাওয়া গেল। দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে গৃহী মানুষ লাফিয়ে পড়ে ফুটপাতে। এরা ক্ষণিকের জন্য শিকল ভাঙার তৃপ্তি পায়।"

এই জাতীয় উচ্চশ্রেণীর চিন্তা করতে করতে নিজ আস্তানার দিকে ফিরছি।

উচ্চশ্রেণীর চিন্তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমার বাবার কঠিন উপদেশের ফল ফলতে শুরু করেছে। এখন আর সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে পারি না। কিছু একটা ভেবে ভেবে হাঁটি।

রাস্তাঘাট আগের মত নিরাপদ না। গভীর রাতে বাড়ি ফিরছি। চোখ-কান খোলা রেখে হাঁটা দরকার। যে কোন মুহূর্তে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যে কোন দিকে ঝেড়ে দৌড় দেয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। সাধারণ মানুষদের মত মহাপুরুষদের জীবন সংশয় হয়। তাছাড়া সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে। বড় ফুপার দেয়া টাকাটা খরচ হয় নি। টাকাটা সাবধানে রাখতে হবে। একটা সময় ছিল যখন মহাপুরুষদের অর্থের প্রয়োজন হত না। এখন হয়। এই যুগের মহাপুরুষদের সেভিংস এবং কারেন্ট দু'টা একাউন্টই থাকা দরকার।

আমার পেছনে ধীর গতিতে একটা রিকশা আসছে। একজন রিকশাওয়ালার কাছে শুনেছি, আস্তে রিকশা চালানো ভয়ংকর পরিশ্রমের ব্যাপার। রিকশা যত দ্রুত চলবে পরিশ্রম হবে তত কম। এই রিকশাওয়ালার পরিশ্রম খুব বেশি হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর সে টুন টুন করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। যদিও ঘণ্টা বাজানোর কোন প্রয়োজন নেই। রাস্তাঘাট ফাঁকা। আমি কৌতূহলী হয়ে পেছনে তাকাতেই রিকশা আমার ধার ঘেঁসে থেমে গেল। যা ভেবেছি তাই। রিকশায় ভদ্র চেহারার একটা মেয়ে বসে আছে। বয়স অল্প, লম্বাটে করুণ মুখ, মাথার চুল বেণী করা। চোখে সম্ভবত কাজল দেয়া, টানা টানা চোখ। মানুষের চোখ এতটা টানা টানা হয় না, গরু-হরিণ এদের চোখ হয়। মেয়েটির পায়ের কাছে বাচ্চাদের স্কুলব্যাগের সাইজের একটা চামড়ার স্যুটকেস। মেয়েটি মুখ বের করে শান্ত গলায় বলল, আপনি কি আমায় একটা উপকার করতে পারবেন? তার গলার স্বর যেমন পরিস্কার, উচ্চারণও পরিস্কার। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। রিকশাওয়ালা রিকশা রেখে খানিকক্ষণ দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরাল। তার ভাবভঙ্গিতে কোন রকম কৌতূহল বা আগ্রহ নেই।

'আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। জামালপুর থেকে রাতের ট্রেনে এসেছি। যাব খালার বাসায় মুগদাপাড়া । মুগদাপাড়া চিনেন?'

'চিনি।'

'অনেক দূর, তাই না?'

'হ্যাঁ। অনেক দূর।'

'আগে বুঝতে পারিনি। আগে বুঝতে পারলে স্টেশনে থেকে যেতাম। অবশ্যি স্টেশনে থাকতে ভয় ভয় লাগছিল। গুণ্ডাধরনের কয়েকটা লোক ঘোরাফেরা করছিল। বিশ্রী করে তাকাচ্ছিল।'

মেয়েটা কথা বলছে হাত নেড়ে নেড়ে। কথা বলার মধ্যে কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই। বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছে কথা বলে সে আরাম পাচ্ছে।

'এখন আমার একা যেতেও সাহসে কুলাচ্ছে না।'

'আপনি কি চাচ্ছেন আমি আপনার সঙ্গে যাই?'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। কিন্তু আমি আবার খালার বাসার ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। একটা কাগজ এনেছিলাম, কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে জায়গাটা কিছু কিছু মনে আছে। দু'বছর আগে একবার এসেছিলাম। দিনের বেলা গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমি এখন কি করতে পারি?'

'রাতটা থাকার জন্যে আপনি আমাকে একটা জায়গা দিতে পারেন? শুধু রাতটা থাকব। ভোরবেলা চলে যাব। আমার খুব উপকার হয়।'

রিকশাওয়ালার সিগারেট শেষ হয়েছে। তারপরেও সে উঠে আসছে না। রাস্তার ধারে বসে আছে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। পিচ করে একবার থুথুও ফেলল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কি?

সে হকচকিয়ে গেল। আচমকা নাম জিজ্ঞেস করলে এই জাতীয় মেয়েরা খুব হকচকিয়ে যায়। এদের বেশ কয়েকটা নাম থাকে। কোনটা বলবে বুঝতে পারে না। কারণ বলতে ইচ্ছে করে আসল নামটি, যে নাম কখনো বলা যাবে না।

আমি বললাম, নাম মনে পড়ছে না?

মেয়েটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। সে যে কি পরিমাণ ক্লান্ত তা তার নিঃশ্বাস থেকে বোঝা যাচ্ছে। আগে বোঝা যায় নি।

'আমার নাম সেতু।'

'আসল নাম?'

'হ্যাঁ আসল নাম। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে আমি আসল নামটা বলি। নকলটা বলি না।'

'শোন সেতু, তোমাকে আমি ধার হিসেবে কিছু টাকা দিয়ে দি। পরে আমাকে শোধ করে দেবে। রাজি আছ?'

'আপনাকে কোথায় পাব?'

'আমাকে পেতে হবে না। আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।'

'কোথায় খুঁজবেন?'

'পথেই খুঁজব।'

'আপনি আমাকে যা ভাবছেন আমি তা না।'

'অবশ্যই তুমি তা না।'

আমি মানিব্যাগ বের করলাম। বড় ফুফার টাকা ছাড়াও সেখানে একটা চকচকে পাঁচ'শ টাকার নোট আছে। সব দিয়ে দেয়া যাক। সেতু হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। সে টাকাগুলি গোনার চেষ্টা করছে। সে আগের মতই শান্ত স্বরে বলল, আপনাকে আমি

চিনি। অনেকদিন আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বগুড়ায়। আমরা থাকতাম সূত্রাপুরে। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে?

'না। বগুড়ায় আমি কোনদিন যাইনি।'

'ভুল বলেছি বগুড়ায় না, ঢাকাতেই দেখা হয়েছে। পুরনো ঢাকায় আগামসি লেনে। আপনি আপনার এক বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসেছিলেন। আপনার পরণে একটা ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি ছিল। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?'

'এক বর্ণও বিশ্বাস করছি না। তুমি কথা বলতে পছন্দ কর। এবং গুছিয়ে কথা বলতে পার। এই স্বভাবের মেয়েরা বানিয়ে অনেক কথা বলে। তুমিও তাই করছ। বাসায় চলে যাও। টাকাটা নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না তো? এ রাস্তায় হাইজ্যাকারের হাতে পড়তে পার।'

সেতু কিছু বলল না। টাকাগুলি সে আবার গুনতে চেষ্টা করছে। সুন্দর একটি মেয়ে। গভীর রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা গুনছে এই দৃশ্য ভাল লাগে না। মেয়েটির এই মুহূর্তে থাকা উচিত ছিল উঁচু দেয়াল-ঘেরা প্রাচীন ধরনের একটা দোতলা বাড়ির শোবার ঘরে। শোবার ঘরের খাটটা থাকবে অনেক বড়। সে শুয়ে থাকবে তার স্বামীর পাশে। না না, পাশে না। দু'জন থাকবে দু'দিকে। মাঝখানে একটি শিশু। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে শিশুটি কেঁদে উঠবে। সেতু জেগে উঠে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করবে। আদুরে গলায় বলবে — কে মেরেছে আমার বাবুকে? কে মেরেছে? কার এত সাহস? কে আমার বাবুকে মারল?

বাবু শান্ত হচ্ছে না। তার কান্না বেড়েই যাচ্ছে। সেতু তার স্বামীকে ডেকে তুলে ভয়ার্ত গলায় বলবে, একটু দেখ না ও এত কাঁদছে কেন? বোধহয় পেট ব্যথা করছে। বাতিটা জ্বালাও তো। সেতুর স্বামী বাতি জ্বালাবেন। আলো দেখে শিশু কান্না থামিয়ে হাসতে শুরু করবে। সেতু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলবে — ওমা, আমার বাবু এত ' হাসটু' করছে কেন? কেন আমার বাবা এত 'হাসটু' করছে? কে আমার বাবাকে কাতুকুতু দিয়ে গেল? কে সেই দুষ্ট লোক?

মেসে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। রূপাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। রূপাদের বাড়িটি প্রাচীন। উঁচু দেয়াল-ঘেরা দোতলা বাড়ি। রূপা যে খাটে ঘুমায় তা আমি কোনদিন দেখিনি, তবে আমি নিশ্চিত সেটা বিশাল একটা খাট।

রাত যদিও অনেক হয়েছে রূপা নিশ্চয়ই ঘুমায়নি। তার এম. এ. পরীক্ষা চলছে। সে অনেক রাত জেগে পড়ে। সে নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে বই হাতে নিয়ে পড়ছে। তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের রাস্তায় দাঁড়ালেই রূপার শোবার ঘরের জানালা দেখা যায়। যদি দেখি জানালায় আলো জ্বলছে তাহলে তাকে একটা টেলিফোন করা

যেতে পারে। আমাদের মেসের সামনে কিসমত রেস্টুরেন্ট সারারাত খোলা থাকে। তাদের একটা টেলিফোন আছে। পাঁচটাকা দিলেই রেস্টুরেন্টের মালিক একটা টেলিফোন করতে দেবে। সমস্যা একটাই, রূপা কি টেলিফোন ধরবে? সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। নিশিরাতের টেলিফোন অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা কখনো ধরে না। রাতের টেলিফোন ধরার দায়িত্ব বাড়ির পুরুষদের। রিং হওয়ামাত্র রূপার বাবা গম্ভীর গলায় বলবেন, কে? উনি কখনো 'হ্যালো' বলেন না। বিনয় করে জিজ্ঞেস করেন না, আপনি কে বলছেন? ধমকের স্বরে জানতে চান — কে?

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাসে ভেজা গন্ধ। গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। মনে হয় আজ রাতেও হবে। বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই ঠিক করলাম। কিছুদূর এগুতেই বৃষ্টির ফোটা পড়তে শুরু করল। দৌড়ে গাছের নিচে আশ্রয় নেবার কোন মানে হয় না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ধীরে সুস্থে এগুনোই ভাল। মেসে পৌঁছলাম কাকভেজা হয়ে।

ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। মেসবাড়ি অন্ধকার। সিঁড়ি ঘরের ছাদ হয়নি বলে বৃষ্টি হলেই সিঁড়ি ভিজে থাকে। খুব সাবধানে রেলিং ধরে ধরে উঠতে হয়। কয়েক পা এগুতেই সিঁড়িতে টর্চের আলো পড়ল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আলো ফেলেছেন বায়েজিদ সাহেব। আমি হাল্কা গলায় বললাম, কি ব্যাপার, বায়েজিদ সাহেব এখনো জেগে আছেন?

'আপনার জন্যে জেগে আছি।'

'কেন বলুন তো?'

'দুপুর বেলায় আপনার বন্ধু এসেছিলেন; রফিক সাহেব। উনি রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেলেন। উনার মা মারা গেছেন এ খবরটা দিতে এসেছিলেন।'

'কিভাবে মারা গেলেন?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিছু বললেন না। উনি প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না।'

আমি ঘরে ঢুকলাম না। ভেজা কাপড়ে ঘরে ঢুকে লাভ নেই। আবার ভিজতে হবে। বায়েজিদ সাহেব নিচু গলায় বললেন, আপনি এখন নারায়ণগঞ্জ যাবেন?

'জ্বী।'

'এত রাতে তো বাস টাস কিছু পাবেন না। তার উপর বৃষ্টি হচ্ছে।'

'হেঁটে চলে যাব।'

'এখুনি কি রওনা দেবেন?'

'হ্যাঁ এখুনি, দেরি করে লাভ নেই। রফিক অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।'

বায়েজিদ সাহেব নিচু গলায় বললেন, আমার ঘরে কেরোসিন কুকার আছে। এক কাপ গরম চা বানিয়ে দেই। চা খেয়ে যান। শরীরটা গরম থাকবে।

'আচ্ছা বানান, এক কাপ চা খাই। রফিক শুধু তার মা'র মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে,

আর কিছুই বলেনি?'

'জ্বি–না।'

আমি আবার রাস্তায় নামলাম, রাত একটা দশ মিনিট। ঘোর দুর্যোগ। ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় একহাঁটু পানি। পানি ভেঙ্গে এগুচ্ছি। চরম দুর্যোগে মানুষকে একা পথে চলতে দেখলে কোত্থেকে না কোত্থেকে একটা কুকুর এসে তার সঙ্গি হয়। ব্যাপারটা আমি আগেও অনেকবার লক্ষ্য করেছি। আজ আবার করলাম। আমি হাঁটছি। আমার পেছনে পেছনে আসছে যমের অরুচি টাইপ এক কুকুর। আমি থামলে সেও থামে, আমি চলতে শুরু করলে সেও চলে।

রফিকদের একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম। মৃত বাড়ির এক ধরনের চরিত্র আছে। অনেক দূর থেকে বোঝা যায় এই বাড়ির একজন কেউ নেই। যত রাতই হোক বাড়ির লোকজন জেগে থাকে। সবার চোখে–মুখে দিশাহারা ভাব থাকে। এরা হাঁটা চলা করে নিঃশব্দে, কিন্তু কথা বলে উঁচুগলায়। গলার স্বরও বদলে যায়। যে কারণে চেনা মানুষ কথা বললেও মনে হয় অচেনা কেউ। যে কথা বলে সে নিজেও নিজের গলার স্বরে চমকে চমকে ওঠে। মৃত বাড়িতে কখনো বিড়াল থাকে না। এরা নিঃশব্দে বিদেয় হয়। আবার যখন সব শান্ত হয়ে আসে, এদের দেখা পাওয়া যায়।

রফিকদের এটা নিজেদের বাড়ি। আত্মীয়স্বজন সব এবাড়িতেই আসবে, এটাই স্বাভাবিক। বাড়ি অন্ধকার। বাইরে বারান্দায় বেঞ্চের উপর একটা বিড়াল শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে না। মাথা উঁচু করে সম্ভবত বৃষ্টি দেখছে। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর বাতি জ্বলল। দরজা খুলে দিল যূথী। শাশুড়ির মৃত্যুতে একটা কাজ হয়েছে বলে মনে হয় — সে বাপের বাড়ি থেকে এসেছে এবাড়িতে।

মনে হচ্ছে সেও ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

যূথী ক্লান্ত স্বরে বলল, ভেতরে আসুন। ও ঘুমুচ্ছে। তিনদিন, তিনরাত কেউ এক পলকের জন্যেও ঘুমুতে পারিনি। যা ঝামেলো গেছে! ইস, ভিজে টিজে কি অবস্থা! এত রাতে আসার দরকার ছিল না।

আমি বললাম, কবর দেয়া হয়ে গেছে?

'জ্বি, বাদ আছর কবর হয়েছে। আত্মীয়স্বজন যাঁরা এসেছিলেন সব রাত আটটার মধ্যে চলে গেছেন। এই বাড়িতে এখন শুধু আমি আর আপনার বন্ধু আছে। আর কেউ নেই। একটা কাজের লোক ছিল, মার অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি হল তখন সে আমাদের টিভিটা নিয়ে পালিয়ে গেল।'

যূথী কথা বলছে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। যেন মৃত্যু কিছুই না। আলাদা গুরুত্ব পাবার মত ঘটনা না। একজন মারা গেছে, তাকে কবর দেয়া হয়েছে। ব্যাস, ফুরিয়ে

গেল। যূথী হাই তুলতে তুলতে বলল,

'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট বার ইঞ্চি টিভি। বিয়ের সময় আমায় যে মামা সিঙ্গাপুরে থাকেন উনি প্রেজেন্ট করেছিলেন। খুব সুন্দর ডিজাইন ছিল। ভায়োলেট কালার। নবগুলি সোনালি। চোর নিয়ে গেছে, কি আর করা যাবে বলুন! কিন্তু মা'র আফসোস যদি দেখতেন। মরবার আধঘন্টা আগেও আমাকে বললেন, ও বৌমা, টিভিটা যে নিয়ে গেল। আমি বললাম, আপনি এত অস্থির হবেন না মা। ও আরেকটা কিনে নিবে। মা বললেন, ও কোত্থেকে কিনবে? ওর কি চাকরি আছে?

তওবা করবার জন্যে এক মৌলানা সাহেবকে ডেকে এনেছিলাম। মা ঠিকই তওবা করলেন। ইশারায় দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর মৌলানা সাহেবকে বললেন, হুজুর আমাদের টিভিটা চুরি হয়ে গেছে। দোয়া কালাম দিয়ে কিছু করা যাবে?

মানুষ মরবার সময় আল্লাহর নাম নিতে নিতে মারা যায়। আম্মা টিভির জন্যে আহাজারি করতে করতে মারা গেলেন। বুঝলেন হিমুদা, ওর যদি টাকা থাকতো ওকে বলতাম একটা টিভি কিনে আনতে। একটা টাকা নেই ওর কাছে। রাস্তায় যে ভিখিরীরা থাকে ওদের কাছেও পাঁচ দশ টাকা থাকে। ওর কাছে তাও নেই। আমার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা এনে এখানকার খরচ সামলালাম। খরচও তো কম না। হিমুদা, আপনি বাথরুমে ঢুকে গোসল করে নিন। সাবান গামছা আছে। মরা বাড়ি। চুলা ধরানোর নিয়ম নেই। আমি খবরের কাগজ জ্বালিয়ে আপনাকে এককাপ চা করে দি। আপনি গোসল করে ওর একটা লুঙ্গি পরে ফেলুন। লুঙ্গি অবশ্যি ধোয়া নেই, ময়লা। ময়লা লুঙ্গি পরতে যদি ঘেন্না লাগে তাহলে আমার একটা সূতির শাড়ি লুঙ্গির মত পেঁচিয়ে পরতে পারেন। নতুন শাড়ি। আমি এখনো পরিনি।

'আমাকে লুঙ্গিই দিন।'

বাথরুম থেকে বের হয়ে চমৎকৃত হলাম। এর মধ্যেই যূথী চা বানিয়ে ফেলেছে। মেঝেতে পাটি পেতে চায়ের কাপ, একবাটি মুড়ি, এক গ্লাস পানি সাজানো।

'হিমুদা, একগাল মুড়ি খান, ঘরে আর কিছুই নেই। চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে কি-না দেখুন। আপনি তো আবার চায়ে চিনি বেশি খান।'

'চা খুব ভাল হয়েছে।'

'ওকে কি ডেকে তুলব? আপনি এসেছেন দেখলে সে বড় খুশি হত। অবশ্যি ওর খুশি বোঝা খুব মুশকিল। ও খুশি না ব্যাজার সেটা কি আপনি বুঝতে পারেন?'

'পারি।'

'আমিও পারি। ও সবচে' খুশি হয় কখন জানেন? যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়। আর কি যে ভরসা আপনার উপর! ওর ধারণা, আপনি সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। আমার বড় মামা যিনি সিঙ্গাপুর থাকেন, তিনি এসেছিলেন।

ওকে ডেকে বললেন, চাকরিটা পাওয়া যায় কিনা দেখ। না পাওয়া গেলে বিকল্প কিছু চিন্তা কর। ছোটাছুটি কর। চুপচাপ বসে থাকলে তো হবে না। ও কি বলল জানেন? ও বলল, হিমুকে বলেছি। ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। আপনি কি কিছু করতে পেরেছেন?'

'চেষ্টা করছি।'

'ভাইয়া বলে চেষ্টা-টেষ্টায় কিছু হবে না। আর হলেও ঐ চাকরি টিকবে না। সাব-হিউমেন স্পেসিসকে কে চাকরিতে রাখবে? দু'দিন পরে আবার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে।'

'আপনার ভাইয়ার কথা ঠিক না।'

'ভাইয়ার কথা সব ঠিক হয়। ভাইয়া না ভেবে চিন্তে কিছু বলেন না। এই বিয়েতে ভাইয়ার কোন মত ছিল না। ভাইয়া ওকে দেখেই বলেছিলেন, যে পুরুষ দেখতে সুন্দর সে কখনো কাজের হয় না। ভাইয়ার কথা আমাদের পরিবারে কেউ ফেলে না। তারপরেও কি করে করে যেন এই বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের পর ভাইয়া বলল, তোর হাসবেন্ড কি করে চাকরি করছে কে জানে। বেশিদিন চাকরি করতে পারার তো কথা না। দেখবি, হুট করে চাকরি চলে যাবে। তুই পড়বি দশহাত পানির নিচে। হলও তাই।'

আমি বললাম, রফিককে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ কি আপনার ভাই এখনো দিচ্ছেন?

'এখন সবাই দিচ্ছে। আমার মামাও সেদিন বললেন। মামা খুব বড় লোক তো, তাঁর কথা কেউ ফেলবে না। বড়লোকদের অন্যায় কথাও মনে হয় ন্যায়।'

'তা হলে তো সমস্যা।'

'শুধু সমস্যা, বিরাট সমস্যা। ভাইয়া বলছিলেন, তোর এখনো ছেলেপুলে হয়নি। তুই একা আছিস। কোন বন্ধন নেই। এখনও তুই অন্য ভাল চিন্তা করতে পারিস। নয়ত পরে খুব আফসোস করবি। তোর হাসবেন্ড মানুষ না। সাব-হিউমেন্ড স্পেসিস। তার বুদ্ধি শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধির চেয়ে খানিকটা বেশি। এখনও সময় আছে।'

'কিসের সময় আছে?'

'আলাদা হয়ে যাবার সময়। ভাইয়া বলছে একটা হাফম্যানের সঙ্গে জীবন কাটাতেই হবে এমন তো কথা না।'

'আপনারও কি ধারণা রফিক হাফম্যান?'

'আমি জানি না। তবে ভাইয়া সব সময় সত্যি কথাই বলে।'

'রফিক কি অপনাকে প্রচণ্ড রকম ভালবাসে না?'

'ও কি করে ভালবাসতে হয় তা-ই জানে না। চুপচাপ বসে থাকা কি ভালবাসা? তবু ভাইয়াকে আমি মিথ্যা করে বলেছি ও আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে।

ভালবাসার কথা বড়ভাইকে বলা লজ্জার ব্যাপার, তবু বললাম।'

'তিনি কি বললেন?'

'ভাইয়া বলল, কুকুর বিড়ালও তো মানুষকে ভালবাসে। ভালবাসা কোন ব্যাপার না।'

'আপনি আলাদা হয়ে যাবার কথা ভাবছেন না তো?'

'যখন ভাইয়ার কথা শুনি, তখন তার কথাই ঠিক মনে হয়। আবার যখন ওকে দেখি এত মায়া লাগে!'

আমি যূথীর দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, একটা গোপন কথা বলছি, আপনাদের দু'জনের একসঙ্গে থাকা ভয়ংকর জরুরি।

'জরুরি কেন?'

'আপনাদের দু'জনকে নিয়ে প্রকৃতির বড় ধরনের কোন পরিকল্পনা আছে। আমার মনে হয়, আপনারা জন্ম দেবেন এমন একটি শিশু, যে ভুবনবিখ্যাত হবে।'

যূথী একই সঙ্গে অবিশ্বাসী ও আনন্দিত গলায় বলল, এসব কে বলল আপনাকে?

'কেউ বলেনি। আমি অনুমান করছি। আপনাদের দু'জনের চরিত্রে কোন মিল নেই আবার একইসঙ্গে অসম্ভব মিল। ও আপনাকে যে পরিমাণ ভালবাসে আপনিও তাকে ঠিক সেই পরিমাণ ভালবাসেন। আবার ভালবাসেনও না। আবার দু'জনের চরিত্রে এক ধরনের নির্লিপ্ততা আছে। যেন কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। চোরের টিভি নিয়ে যাওয়া এবং বাড়ির প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু — দুটি ঘটনা আপনাদের কাছে এক রকম। মায়ের মৃত্যুতে রফিক নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করেনি??

'না করেনি।'

'আপনি যে নিজ থেকে চলে এসেছেন এই নিয়েও সে নিশ্চয়ই কোন মাতামাতি করেনি।'

'মাতামাতি করা ওর স্বভাব না। মা মারা গেছে, একফোটা চোখের জল নেই। আরাম করে ঘুমুচ্ছে।'

'আপনিও শুয়ে পড়ুন। তিনদিন তিনরাত ঘুম হয়নি। নিশ্চয়ই আপনারও ঘুম পাচ্ছে। আর আমার কথা হেলাফেলা করে ফেলে দেবেন না। আমার ইনট্যুইশন ক্ষমতা খুব ভাল। আপনাদের দু'জনের ব্যাপারে যা বলছি তা শুধু অনুমান থেকে বলছি না, ইনট্যুইশন থেকে বলছি। আপনি ওকে ছেড়ে যাবেন না।'

'ছেড়ে তো যাচ্ছি না। ছেড়ে যাবার কথা বলছেন কেন?'

'রফিকের চাকরি-বাকরি নেই। ও এখন নানান অভাব অনটনের মধ্যে থাকবে। আপনার ভাইয়া ক্রমাগত আপনাকে বুঝিয়ে যাবেন, এই জন্যেই বলছি। প্রকৃতির সুন্দর একটা পরিকল্পনা নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'যূথী গম্ভীর গলায় বলল, পরিকল্পনা যদি প্রকৃতির হয় তাহলে তো প্রকৃতিই সেই পরিকল্পনা নষ্ট হতে দেবে না।'

'প্রকৃতি তার পরিকল্পনা ঠিক রাখার চেষ্টা খানিকটা করে। বেশি না। দু'জন স্বাধীন মানুষকে প্রকৃতি দড়ি দিয়ে পাশাপাশি বেঁধে রাখবে না।'

যূথী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে খিল খিল করে হেসে উঠল। রফিকের ঘুম ভাঙল হাসির শব্দে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে এল। আমাকে দেখে মোটেই বিস্মিত হল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। সে আমার সামনে বসতে বসতে বলল, দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, তুই মোটেই দুঃস্বপ্ন দেখিস নি। সুবেহ সাদেকের সময় কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে না। রফিক শুকনো মুখে বলল, আমি তো দেখলাম। মাকে স্বপ্নে দেখলাম। মা বলল, এই রফিক তোর তো চাকরি বাকরি কিছু হবে না। তুই খাবি কি? বৌমা সঙ্গে থাকলেও একটা কথা ছিল। সেও থাকবে না।

আমি আবার বললাম, সুবেহ সাদেকের সময় কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে না। তোর ঠিকই চাকরি হবে আর যূথীও তোকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

'স্বপ্নটা এত স্পষ্ট। মা আমার বিছানার পাশে বসেছিল। আমার বাঁ হাতটা ধরেছিল।'

যূথী আবারো খিল খিল করে হেসে উঠল। কে বলবে আজই এ বাড়িতে একজন মানুষ মারা গেছে। হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বোধহয় বিড়ালটা ঘরে ঢুকেছে। সম্ভবত সে বুঝতে পারছে এ বাড়িতে এখন আর মৃতের ছায়া নেই।

৬

পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর ছাপা হয়েছে। শিরোনাম ঃ মন্ত্রী অপসারিত। তদন্ত টিম। মোবারক হোসেন সাহেবের যে ছবি ছাপা হয়েছে তা দেখে সবার মনে হতে পারে, তিনি অপসারিত হওয়ার কারণে খুব আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁর মুখ হাসিতে ভরা। ডান হাতের দু'টি আঙ্গুলে বিজয়ের 'ভি' চিহ্ন দেখাচ্ছেন। সাংবাদিকদের রসবোধ প্রবল। বেছে বেছে এই ছবিটিই তারা ছেপেছে।

ভেতর খবরের সঙ্গে বিজয়ের 'ভি' চিহ্ন মোটেই সম্পর্কিত নয়। খবর হল — মোবারক হোসেন মন্ত্রী থাকাকালিন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। সরকার এই সমস্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। মন্ত্রীর পাসপোর্ট আটক করা হয়েছে এবং তাঁর দেশত্যাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

জমাট খবর। বিশেষ প্রতিবেদকের নেয়া ইন্টারভ্যু ছাপা হয়েছে ঃ

প্রতিবেদক ঃ আপনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি?

মোবারক ঃ আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আপনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাচ্ছেন?

প্রতিবেদক ঃ খবর শোনার পর পর আপনার মনের অবস্থা কি হয়েছিল?

মোবারক ঃ বিস্মিত হয়েছিলাম।

প্রতিবেদক ঃ দুঃখিত হন নি?

মোবারক ঃ দুঃখিত হবার কারণ ঘটেনি। মন্ত্রীত্ব এমন লোভনীয় কিছু না।

প্রতিবেদক ঃ মন্ত্রীত্ব লোভনীয় না হতে পারে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হতে পারে।

মোবারক ঃ হতে পারে বলছেন কেন? অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হওয়াটাই কি অবশ্যম্ভাবী নয়?

প্রতিবেদক ঃ আপনার কি ধারণা, অভিযোগ প্রমাণিত হবে?

মোবারক ঃ অভিযোগ কি তাই এখনো জানি না। জানলে বুঝতে পারতাম অভিযোগ প্রমাণিত হবে কি–না।

প্রতিবেদক ঃ আপনার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এটা কি সত্য?

মোবারক ঃ সত্য নয়। আমার পাসপোর্ট আমার সঙ্গেই আছে। সঙ্গে না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এই মুহূর্তে দেশের বাইরে যাবার আমার কোন ইচ্ছা নেই।

প্রতিবেদক ঃ বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা কি?

মোবারক ঃ ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে। এর বেশি কিছু না।

প্রতিবেদক ঃ আপনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবার কথা ভাবছেন, এটা কি সত্যি?

মোবারক ঃ আমি নিজে কি ভাবছি না ভাবছি তা আমার চেয়ে সাংবাদিকরা বেশি জানেন বলে সব সময় লক্ষ্য করেছি। কাজেই কিছু বলতে চাচ্ছি না।

ইন্টারভ্যু এখানে শেষ হলেও 'স্টোরি' শেষ না। প্রতিবেদক এর পরেও কিছু লিখেছেন। যেমন, প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়কে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। যদিও এই আপাতঃখুশির পুরোটাই যে অভিনয় তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। কারণ এই প্রতিবেদক জানতে পেরেছেন রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি

প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়ের পারিবারিক জীবনেও সংকট দেখা যাচ্ছে। তাঁর একমাত্র পুত্র দীর্ঘদিন যাবৎ নিখোঁজ। ব্যাপক অনুসন্ধানেও তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর পুত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন — "নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করব না।" প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়ের স্ত্রীও গুরুতর অসুস্থতার কারণে সম্প্রতি গুলশানের এক ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রাক্তন মন্ত্রীর একমাত্র কন্যাও মানসিকভাবে অসুস্থ। তিনি দীর্ঘদিন যাবত একজন মনোবিশ্লেষণ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, তার অসুস্থতা সম্প্রতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

খবরের কাগজের কোন খবর দ্বিতীয়বার পড়া যায় না। এটাই আমি দ্বিতীয়বার পড়লাম। দ্বিতীয়বার পড়ে মনে হল, প্রতিবেদক সাক্ষাৎকারে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। মোবারক হোসেন সাহেব তাঁকে কোনঠাসা করে ফেলেছিলেন। সেই শোধ তিনি নিয়েছেন কন্যার অসুস্থতার খবর দিয়ে। সত্যের সঙ্গে খানিকটা মিথ্যা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

"দশটি সত্যের সঙ্গে একটা মিথ্যা মিশিয়ে দাও, দেখবে মিথ্যাটি সত্য বলে মনে হবে। কেউ এই মিথ্যা আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু দশটি মিথ্যার সঙ্গে যদি একটি সত্যি মিশাও তাহলেও কিন্তু সত্য সত্যই থাকবে। মিথ্যা হবে না।"

এটা আমার বাবার বাণী নয়, এটা আমার নিজের কথা। এসব এখনো পরীক্ষার পর্যায়ে আছে। পরীক্ষা শেষ হলে আমি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হই ,তাহলে লিখে ফেলা যাবে।

মোবারক হোসেন সাহেবের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার। কখন যাব বুঝতে পারছি না। সবচে' ভাল হয় গভীর রাতে উপস্থিত হলে। রাত দশটায় কোন বিশিষ্ট মানুষের বাড়িতে গেলে সম্ভাবনা প্রায় একশ' ভাগ যে বলা হবে এত রাতে উনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। এগারোটার দিকে গেলে বলা হবে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু রাত একটায় উপস্থিত হলে সম্ভাবনা প্রায় নব্বই ভাগ যে বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বিগ্ন মুখে উঠে আসবেন। কাজেই গভীর রাতের দিকে যাওয়াই ভাল।

আমি পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম, বড় ফুপার অফিসে যাব। মাসের এক তারিখ। টাকাটা নিয়ে আসা দরকার। টাকা পেলে এ মাসেও ফুপার বাড়িতে যাব না।

ফুপা অফিসে ছিলেন। আমাকে দেখে বিরস গলায় বললেন, এসো এসো। মনে মনে তোমাকে এক্সপেক্ট করছিলাম।

'টাকা নিতে এসেছি, ফুপা।'

'বুঝতে পারছি। টাকার কথা সবারই মনে থাকে। সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের সবচে' বেশি মনে থাকে। বোস চা খাও।'

'আপনার সামনাসামনি বসব, না খানিকটা দূরে বসব?'

'সামনেই বস।'

'আপনি ভাল আছেন তো ফুপা?'

'ভাল আছি। বাসার অন্য সবাইও ভাল আছে। কাজেই সামাজিক প্রশ্ন-উত্তরপর্ব শেষ। চা কি দিতে বলব?'

'কফি দিতে বলুন। বড়দরের কোন অফিসারের কাছে গেলে কফি খেতে ইচ্ছে করে।'

'ইচ্ছে করলেও খেতে পারবে না। কফি নেই।'

'বেশ, তাহলে চা।'

ফুপা চায়ের কথা বললেন। তার সেক্রেটারিকে বললেন, খানিকক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন। কেউ যেন না আসে। ফুপার মুখ থেকে বিরস ভাবটা কেটে যেতে শুরু করেছে।

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

ফুপা ভুরু কুঁচকে বললেন, স্যার বলছ কেন? তোমার উদ্ভট ধরনের রসিকতা আমার সঙ্গে কখনো করবে না। আমি তোমাকে গোটাদশেক প্রশ্ন করব। তুমি 'হ্যাঁ' এবং 'না' এর মধ্যে জবাব দেবে।

'সব প্রশ্নের জবাব তো ফুপা 'হ্যাঁ' এবং 'না' দিয়ে দেয়া যায় না।'

'আমি এমনভাবে প্রশ্ন করব যেন 'হ্যাঁ' 'না' দিয়ে জবাব দেয়া যায়।'

'ফুপা, কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে 'হ্যাঁ' 'না' দিয়ে জবাব দিলেও জবাব সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমি এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি যার জবাব 'হ্যাঁ' 'না' দিয়ে দেয়া সম্ভব, কিন্তু জবাব হয় না।'

'উদাহরণ দাও।'

'যেমন ধরুন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি আগে যেমন চুরি করতেন এখনো কি করেন? এর উত্তর কি 'হ্যাঁ' 'না' দিয়ে হবে? আপনি যদি বলেন 'না', তার মানে হবে এখন আপনি চুরি করেন না ঠিকই কিন্তু আগে করতেন।'

'চুপ কর।'

'জ্বি ফুপা, চুপ করলাম।'

'তোমরা টাকা আলাদা করে রেখেছি, নিয়ে যাও।'

'থ্যাংকস।'

চা দিয়ে গেছে। ফুপা গম্ভীর মুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে অষুধ খাচ্ছেন। অথচ চা-টা ভাল হয়েছে। এসি লাগানো ঠাণ্ডা ঘরে বসে গরম চা খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'তুমি কি মিথ্যা কথা বল?'

'আগে কম বলতাম, এখন একটু বেশি বলি।'

'কেন বল?'

'একটা পরীক্ষা করছি ফুপা। দশটা সত্যের সঙ্গে একটা মিথ্যা বলে পরীক্ষা করছি সত্যের ক্ষমতা কেমন। এক ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা . . .'

'থাম।'

আমি থামলাম। ফুপা ড্রয়ার থেকে খাম বের করলেন। তিনি টাকা ঠিকই আলাদা করে রেখেছেন। খামের উপর আমার নাম লেখা।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'মিথ্যা বলবে না। যা জিজ্ঞেস করব সত্যিই জবাব দেবে। তুমি আমার বাড়িতে যাওনি ঠিকই কিন্তু আমরা ধারণা বাদল এর মধ্যে কয়েকবার তোমার সঙ্গে দেখা করেছে। সত্যি না মিথ্যা?'

'আংশিক সত্য। কয়েকবার আসেনি। একবার এসেছে। তবে বেশিক্ষণ ছিল না। অল্প কিছু সময় ছিল।'

'আমরা ধারণা, এই আধঘন্টা তুমি তাকে গাছ বিষয়ক কোন বক্তৃতা দিয়েছ।'

'আপনার ধারণা সত্যি। আমি গাছের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা ওকে বলেছি। আফ্রিকান জুলু জাতির মধ্যে এক ধরনের নিয়ম প্রচলিত। গুরুতর অসুস্থ কোন মানুষ শেষ চিকিৎসা হিসেবে স্বাস্থ্যবান কোন গাছকে জড়িয়ে ধরে দিনের পর দিন পড়ে থাকে। তাদের ধারণা, এতে গাছ তাকে জীবনীশক্তি দেয়। প্রায় সময়ই দেখা যায় স্বাস্থ্যবান গাছটা রোগগ্রস্ত হয়, মানুষটা সেরে উঠে।'

ফুপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। ও আইডিয়া পেয়েছে তোমার কাছ থেকে। কয়েকদিন ধরেই দেখছি ও আমাদের বাড়ির পেছনের আমগাছটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি? জবাব দেয় না, হাসে।'

'ওর তো কোন অসুখ-বিসুখ নেই। শুধু শুধু গাছ জড়িয়ে ধরে আছে কেন?'

'অসুখ-বিসুখ নেই বলছ কেন? ওর অসুখ ওর মাথায়। ওর ব্রেইন ডিফেক্ট।'

আমি নিচু গলায় বললাম, ব্রেইন ডিফেক্টের ক্ষেত্রে গাছে চিকিৎসায় লাভ হবে কি-না কে জানে। কাজ হলে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে। দেখা যাবে, বাদল সুস্থ হয়ে গেল কিন্তু গাছটার হয়ে গেল ব্রেইন ডিফেক্ট।

'হিমু, তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছ?'

'জ্বি না, ফুপা। আমি সিরিয়াসলি ভাবছি — গাছের ব্রেইন ডিফেক্ট হয় কি না।

যদি হয় তাহলে গাছ কি করে?'

'শোন হিমু, তোমার কাছে আমি আরেকটা প্রপোজাল দিচ্ছি।'

'দিন।'

'তুমি এই মেস ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন মেসে যাও, যাতে বাদল তোমাকে খুঁজে বের করতে না পারে। পাঁচশ'র বদলে আমি তোমাকে এক হাজার করে টাকা দেব। শুধু তাই না। আই উইল রিমেইন এভারগ্রেটফুল। ছেলেটাকে তোমার ইনফ্লুয়েন্স থেকে বাঁচাতে হবে। সবচে' ভাল হত যদি তোমাকে সারিয়ে তোলা যেত। এতে সমাজের একটা উপকার হত। আচ্ছা, তুমি কি বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হবার কথা ভাব?'

'প্রায়ই ভাবি।'

'তাহলে বিয়ে করে ফেল। বিয়ের যাবতীয় খরচ আমি দেব। একটা শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে কর। আমি মেয়েটার জন্যে একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। তোমরা দু'জন আমার বাড়িতেও থাকতে পার। একতলায় দু'টা ঘর আমি তোমাদের জন্যে ছেড়ে দেব। ধীরে সুস্থে তোমরা আলাদা সংসার শুরু করবে।'

'প্রস্তাব খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে ফুপা।'

'আমি শুধু যে প্রস্তাব দিচ্ছি তাই না — আই মিন ইট। তোমার যে একজন পরিচিত মেয়ে আছে — রূপা, ও কি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?'

'বুঝতে পারছি না। কখনো জিজ্ঞেস করিনি।'

'তাহলে জিজ্ঞেস কর। এখনই কর। টেলিফোন নাম্বার জানা আছে?'

'আছে।'

'Then call her, ask her.'

ফুপা টেলিফোন সেট এগিয়ে দিলেন। আমি হালকা গলায় বলাম, এত তাড়া কিসের ফুপা?

'তাড়া আছে। তুমি টেলিফোন কর। আমার সামনে কথা বলতে তোমার যদি অস্বস্তিবোধ হয় আমি উঠে যাচ্ছি।'

'আপনাকে উঠতে হবে না।'

রূপাকে পাওয়া গেল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কেমন আছ রূপা? সে অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না।

'হ্যালো রূপা?'

'বল, শুনছি।'

'পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?'

'ভাল।'

'কি রকম ভাল?'

'বেশ ভাল। তুমি হঠাৎ এতদিন পর টেলিফোন করলে কি মনে করে?'

'জরুরি কাজে টেলিফোন করলাম।'

'আমার সঙ্গে তো কোন জরুরি কাজ থাকার কথা না।'

'রেগে রেগে কথা বলছ কেন, রূপা?'

'রেগে রেগে কথা বলার কারণ আছে বলেই রেগে রেগে বলছি। তুমি তোমার আস্তানা আবার বদলেছ। পুরানো ঠিকানায় খোঁজ নিতে গিয়ে আমি হতভম্ব। তুমি যে ঘরে থাকতে সেখানে গুণ্ডা ধরনের এক লোক লাল রঙের একটা হাফপেন্ট পরে শুয়েছিল। আমি হতভম্ব। কি যে ভয় পেয়েছিলাম! তোমার কি উচিত ছিল না আমাকে ঠিকানা বদলের ব্যাপারটা জানানো?'

'অবশ্যই উচিত ছিল।'

'তোমার কি উচিত ছিল না আমার জন্মদিনে আসা? আমি রাত এগারোটা পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি। থাক এসব, এখন তোমার জরুরি কথা বল।'

'রূপা, তুমি কি বিয়ের কথা ভাবছ?'

'কি বললে?'

'তুমি বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছ না-কি?'

'পরিষ্কার করে বল কি বলতে চাও?'

'জানতে চাচ্ছিলাম — আমি যদি তোমাকে বিয়ের কথা বলি, তুমি কি রাজি হবে? অল্প কথায় উত্তর দাও। কুইজ ধরনের প্রশ্ন। হ্যাঁ অথবা না।

রূপা শীতল গলায় বলল, তোমার এ জাতীয় রসিকতা আমার ভাল লাগে না। তুমি যে জীবন যাপন কর তাতে এ ধরনের রসিকতার হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আমার জীবনে নেই। তুমি নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট তোমার জীবন নিয়ে করতে পার। আমি পারি না।

'তুমি আসল প্রশ্নের উত্তর দাও নি।'

'সত্যি যদি উত্তর চাও তাহলে বলছি — তুমি চাইলে আমি রাজি হব। আমি জানি তা হবে আমরা জীবনের সবচে' বড় ভুল। তারপরেও রাজি হব। আমি যে রাজি হব তাও কিন্তু তোমার জানা।'

'আচ্ছা রূপা রাখি, কেমন?'

টেলিফোন নামিয়ে আমি করুণ চোখে ফুপার দিকে তাকালাম। ফুপা বললেন, মেয়ে কি বলল? আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হেসে ফেলল। এখনো বোধহয় হাসছে। আপনরা কথায় টেলিফোন করতে গিয়ে আমি একটা লজ্জার মধ্যে পড়লাম। রূপা এমনভাবে হাসছে যেন পাগলের প্রলাপ শুনল। ফুপা আজ উঠি?

ফুপা ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ তারিখ কত?

'আজ হল আপনার ২২ চৈত্র।'

'বাংলা তারিখ দিয়ে কি করব? ইংরেজীটা বল।'

'এপ্রিলের পাঁচ তারিখ।'

'দিনতারিখ কি সব মুখস্থ থাকে?'

'সব দিন থাকে না। আজকেরটা আছে। আজ পূর্ণিমা। প্রতিপাদ শুরু হবে ১/১৫/৫৫-এ'

'প্রতিপাদ ব্যাপারটা কি?'

ব্যাপারটা কি বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ফুপা আমাকে থামিয়ে দিলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, তুমি যাও। পূর্ণিমা দেখ গিয়ে। ভাল করে দেখ।

আসলেই অনেকদিন পূর্ণিমা দেখা হচ্ছে না। জোছনা রাতে পথে বের হলেই পূর্ণিমা দেখা যায় না। তার জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি লাগে।

পূর্ণিমা দেখতে হলে শরীর হালকা করতে হয়। সারাদিনে কখনো গুরুভোজন করা যাবে না। অল্প আহার — ফলমূল, দুধ। দিনে কখনো চোখ মেলা যাবে না। সূর্যালোক দেখা বা গায়ে রোদ লাগানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ। চাঁদ আকাশের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠলে তবেই চোখ মেলা যাবে। তবে তার আগে বরফ-শীতল পানিতে গোসল করে নিতে হবে। পূর্ণিমা দেখতে হবে বনে গিয়ে। আশেপাশে ইলেকট্রিকের আলো, কূপীর আলো বা মোমের আলো কিছুই থাকবে না। জোছনা দেখা যাবে, তবে চাঁদের দিকে একবারও তাকানো যাবে না। সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকতে পারবে না।

এমন কঠিন নিয়ম-কানুনে এখনো জোছনা দেখা হয়নি। তাছাড়া এভাবে জোছনা দেখা দুর্বলচিত্ত মানুষের জন্যে নিষিদ্ধ। এরা সৌন্দর্যের এই রূপ সহ্য করতে পারে না। প্রচণ্ড ভাবাবেশ হয়। যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। জোছনার অলৌকিক জগতে একবার ঢুকে গেলে লৌকিক জগতে ফিরে আসা নাকি কখনোই সম্ভব হয় না।

খুব শিগগিরই এক রাতে জোছনা দেখতে যাব। এদিকের কাজটা একটু গুছিয়ে নেই। রফিকের সমস্যাটা মিটে যাক। মনে অশান্তি রেখে চন্দ্রস্নাত পৃথিবী দেখার নিয়ম নেই।

৭

বেল টিপতেই মোবারক হোসেন সাহেব নিজেই দরজা খুলে দিলেন। সহজ গলায় বললেন, এস হিমু। যেন তিনি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

সাধারণ মানুষ থেকে মন্ত্রী পর্যায়ে উঠা খুব কঠিন, কিন্তু নেমে আসাটা অত্যন্ত সহজ। মোবারক সাহেবকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। উনার পরণে সাদা লুঙ্গি। খালি গা। কাঁধে ভেজা গামছা।

তিনি সহজ গলায় বললেন, শরীরটা তেতে আছে। ভিজে গামছা দিয়ে রাখলাম। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। কোন খবর আছে হিমু?

'না কোন খবর নেই। আপনার খবর নিতে এসেছি।'

'আমার খবর নেবার জন্যে তো বাড়িতে আসার দরকার পড়ে না। পত্রপত্রিকায় রোজই কিছু না কিছু বেরুচ্ছে। পত্রিকা পড় না?'

'মাঝে মাঝে পড়ি।'

'আমার খবর সব আপ-টু-ডেট জান তো?'

'কিছু কিছু জানি।'

'ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করা হয়েছে, এটা জান?'

'না।'

'ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করা হয়েছে। বুদ্ধিমান লোক মাঝে মাঝে প্রথম শ্রেণীর বোকার মত কাজ করে, আমিও তাই করেছি। টাকা-পয়সা অনেক ব্যাংকেই ছিল। ছিল আমার নিজের নামে। কিছু যে অন্যের নামে রাখা দরকার, কিছু ক্যাশ দরকার, এটা কখনো মনে হয়নি।'

'আপনার ব্যাংকে কত টাকা আছে?'

জবাব দেবার আগে মোবারক হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, পাঁচ কোটি টাকার মত।

আমরা ঠিক আগের মত বারান্দায় বসলাম। মোবারক হোসেন সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে মোড়ায় পা তুলে দিলেন। তিতলীকে ডেকে বললেন টক দৈ দিতে।

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

'পাচ কোটি টাকা আছে জানার পরেও তুমি দেখি তেমন অবাক হওনি। পাঁচ কোটি টাকা যে কত টাকা সে সম্পর্কে বোধহয় তোমার ধারণা নেই।'

'অনেক টাকা তা বুঝতে পারছি।'

'পারছ বলে মনে হয় না। অনেক তো বটেই। সেই অনেকটা কত অনেক তা কি জান? পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে কি করা যায় বল তো?'

'পাঁচ কোটি দেয়াশলাই কেনা যায়। একটা দেয়াশলাইয়ের দাম এক টাকা। তবে একসঙ্গে এত টাকার দেয়াশলাই কিনলে কিছুটা বোধহয় সস্তায় দেবে। আট আনা পিস পাওয়া যেতে পারে। তাহলে দশ কোটি দেয়াশলাই পাওয়া যাবে। এই জীবনে আর দেয়াশলাই কিনতে হবে না।'

'তুমি ব্যাপারটাকে ফানি সাইডে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছ। ফানি সাইডে নেবার দরকার নেই — পাঁচ কোটি টাকা যে কি পরিমাণ টাকা আমি অন্যভাবে তোমাকে

ধারণা দেই। ধর, টাকাটা তুমি যদি শুধু ব্যাংকে রেখে দাও তাহলে কি হবে? ফিফটিন পারসেন্ট রেটে ইন্টারেস্ট কত আসে? মনে মনে হিসেব করতে পার। ফাইভ টাইমস ফিফটিন, ডিভাইডেড বাই . . .'

আমি তাকিয়ে আছি। মোবারক হোসেন সাহেব চোখ বন্ধ করে হিসেব করে যাচ্ছেন। তিতলী যখন এসে বলল, বাবা দৈ নাও, তখন বিরক্ত মুখে চোখ মেললেন। তাঁর হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। অসময়ে আসার জন্যে তিনি মেয়ের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। তিতলী বলল, বাবা, আমি তোদের সঙ্গে বসব?

'আমাদের সঙ্গে বসার দরকার কি?'

'বারান্দায় চা দিতে বলেছি এই জন্যেই বসতে চাচ্ছি।'

সে আমার মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসল। বাবাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমাকে বলল, ভাইয়ার কোন খোঁজ পেয়েছেন?

'না।'

'খোঁজার চেষ্টা করেছেন?'

'না, তাও করিনি।'

'এই সত্যি কথাটি যে বললেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। এসেছেন কি জন্যে? আমাদের দুর্দশা দেখতে?'

আমি সহজ গলায় বললাম, আমি আসলে একটা সুপারিশ নিয়ে এসেছি। একজনের চাকরি-বিষয়ে একটা সুপারিশ। আমার এক বন্ধুর চাকরি চলে গেছে। পুরোপুরি এখনো যায়নি, সামান্য সূতায় ঝুলছে। আপনার বাবার সুপারিশে হয়ত তার চাকরিটা হবে।

তিতলী বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। মোবারক হোসেন সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, তুমি কি সত্যি সুপারিশ নিতে এসেছ?

'জ্বি স্যার। সবাই তো মন্ত্রীত্ব থাকাকালিন সময়ে নানান সুপারিশ নিয়ে আসে, আমি এসেছি যখন আপনার মন্ত্রীত্ব নেই। কিছুই নেই।'

'তুমি তাহলে জেনেশুনেই এসেছ আমার সুপারিশে কাজ হবে না?'

'তা নয় স্যার। আমি জানি, আপনার সুপারিশে এখন অনেক বেশি কাজ হবে। কারণ সবাই জানে, আপনি আবার স্টেজে আসবেন। আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যদিও এখন আপনি কেউ না — নো বডি ; তবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা আপনাকে খুশি রাখবে।'

'যার সুপারিশ করতে এসেছে তার নাম কি? সুপারিশ কার কাছে করতে হবে?'

আমি পকেট থেকে কাগজ বের করতে করতে বললাম, সব এখানে লেখা আছে স্যার। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর নাম রফিক।

'তুমি বস, আমি টেলিফোন করে দেখি। তোমার কথা সত্যি কি-না পরীক্ষা হয়ে

যাক।'

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। তিতলী নামের রাগী এবং অহংকারী মেয়েটি আমার সামনে বসে আছে। তার ঠোঁটে হাসির ক্ষীণ আভাস। কি মনে করে সে হাসছে কে জানে। আমি বললাম, আপনার মা কেমন আছেন?

'ভাল না।'

'উনার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন, উনাকে একটু দেখতে যাব?'

'কেন?'

'এম্নি যাব।'

'আপনি বিনা উদ্দেশ্যে কিছু করেন না। আপনার কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা বলুন। তারপর ঠিকানা দেব।'

উদ্দেশ্য বলার সময় হল না। মোবারক হোসেন সাহেব ফিরে এসেছেন। তিনি ইজিচেয়ারে বসতে বসতে বললেন, হিমু, তুমি তোমার বন্ধুকে আগামীকাল চাকরিতে জয়েন করতে বল। আমি কথা বলেছি।

'ধন্যবাদ স্যার, আমি তাহলে উঠি?'

'বোস, চা খেয়ে যাও। চা আনছে।'

এদের বাড়ির বড়বুবু চা দিয়ে গেছে। মোবারক হোসেন সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। তিতলী চায়ের কাপ মুখের কাছে নিয়ে নামিয়ে রেখেছে। মনে হচ্ছে কিছু বলবে, কি বলবে তা গুছাতে সময় লাগছে। সে বাবার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। মোবারক সাহেব বললেন, তোর কি হয়েছে?

'কিছু হয়নি।'

'এরকম করে তাকাচ্ছিস কেন?'

'যেভাবে আমি তাকাই সেই ভাবেই তাকাচ্ছি।'

'তুই এখান থেকে যা। আমি হিমুর সঙ্গে কথা বলব।'

'যা বলার আমার সামনেই বল। আমি কোথাও যাব না।'

সে আবারো চায়ের কাপ মুখের কাছে নিল, আবারো নামিয়ে রাখল। মেয়েটির এই হঠাৎ পরিবর্তনের কোন কারণ ধরতে পারছি না। আমি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, স্যার আজ যাই। অন্য আরেক দিন আসব। তিতলী বলল, অন্যদিন টন্যদিন না। আপনি আর এ বাড়িতে আসবেন না। আর কেউ জানুক না জানুক আমি জানি ভাইয়া নিখোঁজ হয়েছে আপনার কারণে। আপনাকে আমি এত সহজে ছাড়ব না।

আমি আবার বসে পড়লাম। মোবারক সাহেব বললেন, ক'টা বাজে দেখতো হিমু।

'স্যার আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই।'

মোবারক সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর ঘড়িতে ক'টা বাজে মা? তিতলী জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল। তেজী ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে গেল।

মোবারক সাহেব বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মেয়েটা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ছে। টেনশান নিতে পারছে না। ঘন ঘন ইমোশনাল আউটবার্স্ট হচ্ছে। সুখের কথা হচ্ছে এইসব আউটবার্স্টের স্থায়িত্ব অল্প। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নেবে। হিমু ঐ শোবার ঘরে ঢুকে দেয়াল ঘড়িতে সময় কত হয়েছে দেখ তো?

আমি ঘড়ি দেখলাম, ন'টা একুশ। তিনি আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজের মনে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, তিতলীর মা'কে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্যে নেয়া দরকার। ব্যাংককের আমেরিকান হাসপাতাল ভাল চিকিৎসা করে সেখানেই নেয়ার কথা, নিতে পারছি না। টাকার সমস্যা তো আছেই, তার চেয়েও বড় সমস্যা আমাকে বাইরে যেতে দেবে না। একজনের কাছে টাকা চেয়েছিলাম, রাত আটটায় তার দিয়ে যাবার কথা। মনে হয় সে আর আসবে না। তোমার কি মনে হয়?

'না আসার সম্ভাবনাই বেশি।'

'মানুষকে চেনা বড়ই মুশকিল। যার টাকা নিয়ে আসার কথা সেও বলতে গেলে কোটিপতি। তাকে কোটিপতি করেছি আমি। প্রয়োজনীয় পারমিটগুলির আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি। হিমু, তোমার কি ধারণা এই পৃথিবীতে কত ধরনের মানুষ আছে?'

'স্যার, পৃথিবীতে মাত্র দু' ধরনের মানুষ আছে।'

'দু' ধরনের?'

'জ্বি, আমি সমস্ত মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে আছে 'হ্যাঁ-মানুষ।' এরাই দলে ভারী। বলতে গেলে সবাই এই দলে। মানুষের সবগুণ তাদের মধ্যে আছে, আবার দোষও আছে। কোনটাই বেশি না। সমান সমান। প্রকৃতি সাম্যাবস্থা পছন্দ করে। একটা পরমাণুর কথাই ধরুন না কেন, পরমাণুতে নেগেটিভ চার্জের যতগুলি ইলেকট্রন আছে পজিটিভ চার্জের ঠিক ততগুলিই প্রোটন আছে। 'হ্যাঁ মানুষ'গুলি পরমাণুর মত।

দ্বিতীয় দলে আছে, 'না-মানুষ।' মানুষের কোন কিছুই তাদের মধ্যে নেই, তারা শুধু দেখতেই মানুষের মত। আসলে এরা পিশাচ ধরনের। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নীতি এদের মধ্যে কাজ করে না। এদের মনে কোন রকম মমতা নেই। একটা খুন করে এসে হাত মুখ ধুয়ে ভাত খাবে, পান খাবে, সিগারেট টানতে টানতে দু'একটা মজার গল্প করে ঘুমুতে যাবে। তাদের ঘুমের কোন সমস্যা হবে না। কারণ 'না-মানুষ'রা

সাধারণত স্বপ্ন দেখে না। আর দেখলেও দুঃস্বপ্ন কখনো দেখে না।'

'এই জাতীয় মানুষ তুমি দেখেছ?'

'জ্বি দেখেছি, এই জাতীয় মানুষদের সঙ্গে আমি অনেকদিন ছিলাম। আমরা মামারা সবাই এই জাতীয় মানুষ।'

'বল কি?'

'আমার বড় মামা নিজে খুন হয়েছিলেন। কিছু লোকজন মাছ মারার বড় থোর দিয়ে তাঁকে এফোড় ওফোড় করে ফেলেছিল। এই অবস্থাতেও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেথ বেড কনফেসন করে চারজন নির্দোষ মানুষকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন এরাই তাকে মেরেছে। ডেথ বেড কনফেসনের কারণে ঐ চারজনের যাবজ্জীবন হয়ে গেছে।'

'আশ্চর্য।'

'আমার মেজো মামা গোটা পাঁচেক খুন করেছেন। অতি ধুরন্দর ব্যক্তি। তাকে কেউ ফাঁসাতে পারেনি। বহাল তবিয়তে এখনো বেঁচে আছেন — সত্তুরের উপর বয়স। চোখে দেখতে পান না। কেউ কাছে গিয়ে বসলে খুনের গল্প করেন। এই গল্প বলতে পারলে খুব আনন্দ পান। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি মানুষ জবেহ করলে কণ্ঠনালী দিয় ফুস করে গরম বাতাস বের হয়।'

'চুপ কর।'

আমি গল্প থামিয়ে মোবারক সাহেবের মতই পা নাচাতে লাগলাম। মোবারক সাহেব আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন, তিক্ত গলায় বললেন, 'অবলীলায় তুমি এই গল্প করলে। তোমার খারাপ লাগল না?'

'না।'

'ওদের রক্ততো তোমার শরীরেও আছে।'

'তা আছে। আমার বাবা দেখে শুনে ঐ পরিবারে বিয়ে করেছিলেন যাতে আমি মায়ের দিক থেকে তেইশটি ভয়াবহ ক্রমোজম নিয়ে আসতে পারি।'

'আনতে পেরেছ?'

'ঠিক ধরতে পারছি না।'

'না–মানুষদের কথা শুনলাম। সাধু সন্ন্যাসীরা কোন শ্রেণীর? যারা মহাপুরুষ তাদের দলটা কি?'

'তারাও না–মানুষ। পিশাচ এবং মহাপুরুষ সবাই এক দলে। এরা মানুষ নন।'

'এই জাতীয় কথাবার্তা কি তুমি সব সময় বল, না আজ আমাকে বলছ?'

'সব সময় বলার সুযোগ হয় না। সুযোগ হলে বলার চেষ্টা করি। আমার কিছু শিষ্য আছে। এরা আগ্রহ করে আমার কথা শুনে, বিশ্বাসও করে।'

'তুমি নিজেকে কোন দলে ফেল? 'না–মানুষে'র দলে?'

'জ্বি না। তবে 'না–মানুষ' হবার চেষ্টা করছি, যদিওবা জানি চেষ্টা করে 'না–মানুষ' হওয়া খুব কঠিন। জন্মসূত্রে হতে হয়। আপনি যেমন জন্মসূত্রে না–মানুষ।'

'পিশাচ অর্থে বলছ নিশ্চয়ই।'

'জ্বি পিশাচ অর্থেই বলছি। তবে পিশাচ 'না–মানুষ'দের একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এরা খুব সহজেই মহাপুরুষ 'না–মানুষ' হতে পারে। 'হ্যাঁ–মানুষ'রা তা কখনোই পারবে না।'

'তুমি কি আমাকে 'প্রীচ' করার জন্যে এসব কথা বলছ?'

'জ্বি–না, আমি ধর্ম প্রচারক না। আমি একজন সাধারণ 'হ্যাঁ–মানুষ', যে একজন বন্ধুর চাকরির জন্যে মন্ত্রীর কাছে ছোটাছুটি করে। মহাপুরুষরা এই কাজ কখনো করবেন না। তাঁদের মমতা কখনো একজনের জন্যে না — অনেকের জন্যে। তাঁরা ব্যক্তিকে দেখেন না, তাঁরা সমষ্টিকে দেখেন।'

'হিমু।'

'জ্বি স্যার।'

'যাও বাড়ি যাও। একটা কথা তোমাকে বলি — তুমি অতিশয় ধুরন্দর ব্যক্তি। সুঁচ হয়ে ঢোকার চেষ্টায় আছ। আমার ব্যাপারে এই চেষ্টা করবে না। শিষ্য হবার বয়স আমার না। এই বয়সে তোমার শিষ্য হবো এরকম মনে করার কোন কারণ ঘটেনি। আল্লা, খোদা, পাপ, পুণ্য এসব নিয়ে আমি কোন দিনই মাথা ঘামাইনি। ভবিষ্যতেও ঘামাব না। যাবার আগে আরেকটি কথা শুনে যাও — তুমি যে কাজে এসেছিলে সে কাজ হয়ে গেছে — বন্ধুর চাকরি হয়েছে। কাজেই এ বাড়িতে আর আসবে না।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। জহিরের কোন খোঁজ যদি পাই তাহলে কি আসব?'

'না। তাহলেও আসবে না। ভাল কথা জহিরও কি তোমার শিষ্য?'

'জ্বি না। এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন শিষ্য পেয়েছি। আমার ফুফাতো ভাই বাদল, তার তরঙ্গিনী ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেলস–ম্যান আসাদ।'

'উপদেশ দেয়া আমার স্বভাব না। তবু একটা উপদেশ দেই, শিষ্যের সংখ্যা আর বাড়িও না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি কর কি? কাজকর্মের কথা বলছি না। কাজকর্ম যে কিছু কর না তা বুঝতে পারছি — তারপরেও মানুষ কিছু করে, সেটাই জানতে চাচ্ছি।'

'আমি ঘুরে বেড়াই। ইন্টারেস্টিং কোন কিছু চোখে পড়লে আগ্রহ নিয়ে দেখি।'

'একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসের কথা বল, তাহলে বুঝতে পারব কোনটা তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং কোনটা নয়।'

'সব কিছুই আমার কাছে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং লাগে। তবে একটা দৃশ্য

একবার দেখলেই ইন্টারেস্ট নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার দেখতে ইচ্ছা করে না। সেই অর্থে সব ইন্টারেস্টিং জিনিসই মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। দু' একটা বাকি। সেগুলি দেখা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমাকে বল, দেখি আমি পারি কি না।'

'একটা মানুষকে যখন ফাঁসি দেয়া হয় তখন সে কি করে তা আমার খুব দেখার শখ। অর্থাৎ ফাঁসির মঞ্চে উঠবার আগে সে কি করে তাকায়, কিভাবে নিঃশ্বাস নেয়। অবধারিত মৃত্যুর কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মৃত্যুক্ষণ জানি না বলে ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। যদি মৃত্যুক্ষণটা জেনে যাই তখন কি হয় সেটাই আমার দেখার বিষয়।'

'মানুষদের যে দু'টি শ্রেণীর কথা বললে তার বাইরেও একটা শ্রেণী আছে — উন্মাদ শ্রেণী। তুমি সেই শ্রেণীর। এমন উন্মাদ যা চট করে বোঝা যায় না। আমার আগে কি তোমাকে এই কথা কেউ বলেছে?'

'আমরা ফুপা প্রায়ই বলেন?'

'তাঁকে আমার রিগার্ডস দেবে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে দেন না?'

'ইদানীং দিচ্ছেন না। তাঁর বাড়িতে যাতে না যাই সে জন্যে আমি মাসে মাসে পাঁচশ টাকা পাই।'

'শুনে ভাল লাগল। আচ্ছা তুমি যাও। তুমি আমার যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছ, আর না।'

রাস্তায় নেমে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম কোথায় যাব। রফিককে চাকরির খবরটা দেয়ার জন্যে নারায়ণগঞ্জ যাওয়া দরকার। যেতে ইচ্ছা করছে না, মাথায় চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে ভয়ংকর ব্যথা আবার আসছে। ব্যথাটা পথের মধ্যে আমাকে কাবু করার আগেই বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। দরজা জানালা বন্ধ করে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকতে হবে। মাথা ঢেকে রাখতে হবে ভেজা গামছায়। কিছু খেয়ে নেয়াও দরকার। একবার ব্যথা শুরু হলে চব্বিশ ঘন্টা কিছু মুখে দিতে পারব না। কড়া কিছু ঘুমের অষুধ খেয়ে নিলে কেমন হয়? এমন ডোজে খেতে হবে যাতে চব্বিশ ঘন্টা মরার মত ঘুমিয়ে থাকি। ঘুম ভাঙ্গলে দেখব মাথার যন্ত্রণা নেই। বড় দেখে একটা ফার্মেসীতে ঢুকে পড়লাম।

'কড়া কিছু ঘুমের অষুধ দিতে পারবেন?'

'ফার্মেসীর মাঝবয়েসী কর্মচারী নির্লিপ্ত গলায় বলল, ডাক্তারের প্রেক্রিপসন ছাড়া পারব না।'

'ডাক্তার এখন কোথায় পাব বলুন। বিরাট সমস্যা — আমার এক ছোটভাই

আছে মেন্টাল কেইস। খুব বাড়াবাড়ি করলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। এখন খুব বাড়াবাড়ি করছে অথচ ঘরে অষুধ নেই।'

'উনার প্রেসক্রিপসনটা নিয়ে আসেন।'

'ছুটে বের হয়ে এসেছি, প্রেসক্রিপসনের কথা মনে ছিল না ভাই। কি যে যন্ত্রণা করছে — লম্বা লাঠি নিয়ে সবাইকে তাড়া করছে। এই সময় কি আর প্রেসক্রিপসনের কথা মনে থাকে?'

'তাকে কোন অষুধ দেয়া হয় এটা জানা দরকার না?'

'এতদিন ফার্মেসী চালাচ্ছেন, আপনি কি ডাক্তারের চেয়ে কম জানেন নাকি? এমন একটা কিছু দিন যাতে চব্বিশ ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকে।'

'হিপনল নিয়ে যান। দশ মিলিগ্রমের চারটা ট্যাবলেট খাইয়ে দেন। চব্বিশ ঘন্টা নড়াচড়া করবে না।'

'মরে যাবে নাতো?'

'আরে না। মানুষ মরা কি এত সহজ?'

'খাওয়ার কতক্ষণ পর এ্যাকশান হয়?'

'আধ ঘন্টার মধ্যে এ্যাকশন শুরু হবে।'

'দিন তাহলে চারটা হিপনল।'

চারটা হিপনল ফার্মেসীর কর্মচারীর সামনেই মুখে দিয়ে গিলে ফেললাম। হাসি মুখে বললাম, একগ্লাস পানি দিন — মুখ তিতা তিতা লাগছে।

ভদ্রলোক কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। তার চোখ অবশ্যি বড় বড় হয়ে গেল। পানি এনে দিলেন। আমি এক চুমুকে পানি খেয়ে হাই তুলতে তুলতে বললাম, একটা টেলিফোন করব। টেলিফোনটা দিন। ভয় নেই, কল পিছু পাঁচটা করে টাকা দেব। আমার বন্ধুকে একটা খবর দিতে হবে। ওর চাকরি হয়েছে সেই খবর। অবশ্যি বন্ধুর বাড়িতে টেলিফোন নেই। ওদের পাশের বাসায় একটা টেলিফোন আছে — অন রিকোয়েষ্ট। অর্থাৎ বিনীত গলায় বললে ওরা ডেকে দেয়।

'টেলিফোন তালাবন্ধ।'

'তালাবন্ধ থাকলে খোলরার ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি করবেন ততই ভাল। বেশি দেরি হলে আপনার দোকানে ঘুমিয়ে পড়ব। আমার হার্ট খুবই দুর্বল। যে কড়া ঘুমের অষুধ খাইয়েছেন — এখানেই ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যেতে পারে। তখন আপনি বিপদে পড়বেন। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়া ওষুধ দিয়েছেন।'

ভদ্রলোক শংকিত ভঙ্গিতে টেলিফোন বের করে দিলেন। তালাও খোলা হল। আমি ডায়াল করতে করতে বললাম, মিথ্যা কথা বলবেন না ভাই। ছোটখাট মিথ্যা বলতে বলতে পরে অভ্যাস হয়ে যাবে। একদনি দেখবেন ক্রমাগত মিথ্যা বলছেন। এই যে নাম্বারটা ডায়াল করছি ওদের যখন বলব পাশের বাসার রফিককে একটু

ডেকে দিন ওরা বলবে এখন সম্ভব হবে না। বাসায় কাজের লোক নেই। ওরা একটা মিথ্যা কথা বলবে, যে কারণে ওদেরকে রাজি করানোর জন্যে আমাকে একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। মিথ্যা নিয়ে আসে মিথ্যা। সত্য জন্ম দেয় সত্যের। বুঝতে পারছেন তো ভাই সাহেব?

'হ্যালো?, হ্যালো।'

ও পাশ থেকে অল্প বয়েসী মেয়ের গলা পাওয়া গেল। রিণরিণে মিষ্টি গলা, আপনি কাকে চাচ্ছেন?

'তোমাদের পাশের বাড়ির রফিককে যার মা মারা গেছেন।'

'উনাকে তো এখন ডাকা যাবে না। আমাদের বাসায় এখন কাজের লোক নেই।

'কাজের লোক কখন আসবে? অর্থাৎ কখন টেলিফোন করলে রফিককে ডেকে দেয়া যাবে?'

'আমাদের কাজের লোকতো ছুটিতে দেশে গেছে। কবে আসবে কে জানে?'

'তাহলে তো তোমাদের খুব সমস্যা হল।'

'আপনি কে?'

'আমি একজন অকাজের লোক। শোন খুকি, এই বয়সেই মিথ্যা কথা বলা শুরু করেছ কেন? রফিককে ডাকা যাবে না এটা সরাসরি বলে দিলেই ঝামলো চুকে যায়। মাঝখান থেকে মিথ্যা করে কাজের লোকের কথা বলছ।'

'আমি তো মিথ্যা বলছি না।'

'বেশ ধরে নিলাম মিথ্যা বলছ না — সত্যি তোমাদের বাসায় কাজের লোক নেই, তাহলেওতো তুমি চট করে তাকে খবরটা দিতে পার। পার না?'

'না পারি না। কারণ আমার চিকেন পক্স। আমাকে মশারির ভেতর থাকতে হয়।'

'খুকী, আবার মিথ্যা কথা বলছ? একটা মিথ্যা বললে দশটা মিথ্যা বলতে হয়। কাজের লোক দিয়ে শুরু করেছ — এখন চলে এসেছো জল বসন্তে। আরো খানিকক্ষণ কথা বললে আরো মিথ্যা বলবে।'

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে ফেলল। হাসিটা শুনে ভাল লাগল। এত আন্তরিক ভঙ্গির আনন্দময় হাসি অনেকদিন শুনিনি। সঙ্গে সঙ্গে মন ভাল হয়ে গেল। মাথার যন্ত্রণা চট করে খানিকটা কমে গেল। আমি কোমল গলায় বললাম, হাসছ কেন খুকী?

'আপনার পাগলামী ধরনের কথাবার্তা শুনে খুব মজা লাগল। এই জন্যে হাসছি। আপনি ধরুন, আমি রফিক ভাইয়াকে ডেকে দিচ্ছি।'

মেয়েটি আরো খানিকক্ষণ হাসল। হাসতে হাসতে বলল, আমাকে খুকী খুকী করছেন এই জন্যেও খুব মজা লাগল। আমি মোটেই খুকী না। মেডিক্যাল কলেজে

ফিফথ ইয়ারে পড়ি। এবং আমার সত্যি সত্যি চিকেন পক্স। বাসায় শুধু যে কাজের লোক নেই তাই না, কেউই নেই। সবাই বিয়ে বাড়িতে গেছে। আমার খালাত বোনের বিয়ে। আমরা কথা কি সত্যি বলে মনে হচ্ছে?

'হ্যাঁ হচ্ছে।'

'ধরে থাকুন, আমি ভাইয়াকে ডাকছি।'

'তাকে ডাকতে হবে না। তাকে শুধু একটা খবর দিয়ে দেবেন যে, তার চাকরির ঝামেলা মিটেছে। সে যেন কালই অফিসে যায়। আর আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'আপনাকে ক্ষমা করা হল।'

মেয়েটা আবারো হাসছে। আমি টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। মাথার যন্ত্রণা পুরোপুরি চলে গেছে। আমি ফার্মেসীর কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। সে শিউরে উঠল। আমি বললাম, কই ঘুম তো আসছে না। আরো দু'টা হিপনল দিন। এক গ্লাস পানি আনুন। আরেকটা কথা ভাই সাহেব, আপনার দোকানেই আজ ঘুমাব বলে স্থির করেছি। আপনি কি কোন বেঞ্চ-টেঞ্চ দিতে পারেন? ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়া ওষুধ দেয়ার বিপদ দেখলেন?

৮

মোবারক হোসেন সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। নিধু বৈরাগী হত্যা মামলা। চার বছর আগের হত্যাকাণ্ড। নিধু বৈরাগীর ছোটভাই নিতাই বৈরাগী চার বছর পর মোবারক হোসেনকে আসামী করে মামলা করেছে। মামলা তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে সিআইডি পুলিশের উপর। তদন্তকারী অফিসার সাংবাদিকদের বলেছেন, তদন্তের গতি সন্তোষজনক। এমন সব এভিডেন্স পাওয়া গেছে যা এত সহজে চট করে পাওয়া যায় না। মোরবারক হোসেন সাহেবকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

ঐ বাড়িতে আমার যাওয়া নিষেধ, তবু একদিন গেলাম। বাড়ির গেটে তালা ঝুলছে। বিরাট তালা। বাড়ির লোকজন কোথায় কেউ বলতে পারল না। কোথায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে তাও কেউ জানে না। মানুষজন না থাকলে অতি দ্রুত বাড়ির মৃত্যু ঘটে। বাড়ির আশেপাশে দাঁড়ালেই গা ছমছমানো ভাব হয়। বাড়ির সামনের পান সিগারেটের দোকানের ছেলেটা বলল, উনার দেশের বাড়িতে যান। ঐখানে খোঁজ পাইবেন।

'দেশের বাড়ি কোথায়?'

'কুমিল্লা।'

'কুমিল্লার কোথায়?'

'তা তো ভাইজান জানি না।'

'বাড়ি তালাবন্ধ থাকে, কেউ খোঁজ নিতে আসে না?'

'মন্ত্রী সাহেবের মেয়ে একদিন আসছিলেন। খুব কান্নাকাটি করলেন।'

'কবে এসেছিল?'

'তাও ধরেন এক হপ্তা।'

গুলশানের কোন এক ক্লিনিকে উনার স্ত্রী ছিলেন। গুলশান এলাকার যত ক্লিনিক ছিল সব খোঁজলাম। মোবারক হোসেন সাহেবের স্ত্রী তার কোনটিতেই নেই। কোন দিন না-কি ছিলেন ও না। এদের কোন খোঁজ বের করার একমাত্র উপায় হল মোবারক হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করা। সেটা কি করে সম্ভব তাও বুঝতে পারছি না। জেলখানার গেটে গিয়ে যদি বলি — আমি প্রাক্তন মন্ত্রী মোবারক হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাহলে তারা যে খুব আনন্দের সঙ্গে আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। নারায়নগঞ্জ থানার ওসি সাহেবকে টেলিফোন করলাম। উনি যদি কোন সাহায্য করতে পারেন। ভদ্রলোক বিমর্ষ গলায় বললেন — আমি সামান্য ওসি। আমার স্থান চুনোপুটিরও নিচে — আর এই মামলা, রুই-কাতলার মামলা। দেখা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

'তবু চেষ্টা করে দেখি। কি করতে হবে বলুন তো?'

'নিয়মকানুন আমিও ঠিক জানি না। ডি আই জি প্রিজনকে এ্যাডড্রেস করে দরখাস্ত করতে হবে। কেন দেখা করতে চান, আসামীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি -- সব দরখাস্তে থাকতে হবে। আমি খোঁজ-খবর করে একটা দরখাস্ত না হয় আপনার জবানীতে লিখে নিয়ে আসি।'

'এতটা কষ্ট আপনি করবেন?'

'অবশ্যই করব। আপনি বিকেলে আপনার মেসে থাকবেন। আমি সব তৈরি করে নিয়ে আসব। কাজ হবে কি-না তা কিন্তু জানি না।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। রাখি তাহলে?'

'এক সেকেন্ড হিমু সাহেব, আপনি কি দু' মিনিটের জন্যে আমার স্ত্রীকে একটু দেখতে যাবেন? ওকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্যানসার ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়েছি। এখন সে একেবারে শেষের অবস্থায় আছে। আমি দিনরাত প্রার্থনা করি শেষটা যেন তাড়াতাড়ি আসে। আমি নিজেই সহ্য করতে পারছি না । হিমু সাহেব, ভাই যাবেন? আমি আমার স্ত্রীকে আপনার কথা বলেছি।'

'আসুন এক সঙ্গে যাব।'

'ও এখন কথা বলতে পারে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে লিখে জবাব দেয়।'

'আমি উনাকে কি বলব?'

'আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি পাশে কিছুক্ষণ থাকলেই ওর ভাল লাগবে। আপনার সম্পর্কে আমি ওকে বলেছি।'

'কি বলেছেন?'

'তেমন কিছু না। বলেছি, আপনি সাধক প্রকৃতির মানুষ। আপনি পাশে দাঁড়ালেই ও সাহস পাবে। অন্য একটা জগতে যাত্রা। সে যাচ্ছেও একা একা। খুব ভয় পাচ্ছে।'

ওসি সাহেবের গলা ধরে এল। কথা জড়িয়ে এল। আমি শান্ত স্বরে বললাম, ওসি সাহেব, আপনি কাঁদছেন না-কি? ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক গলায় বললেন, কাঁদছি না। আমরা পুলিশ। এত সহজে কাঁদলে কি আমাদের চলে?

ভদ্রমহিলা বোধহয় ঘুমুচ্ছিলেন। ওসি সাহেবকে নিয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর ঘুম ভাঙ্গল। ভদ্রমহিলা এককালে রূপবতী ছিলেন কি ছিলেন না আজ তার কিছুই বোঝার উপায় নেই। কুৎসিত চেহারা। মাথায় কোন চুল নেই। মুখের চামড়া শুকিয়ে হাড়ের সঙ্গে লেগে গেছে। একটা জীবন্ত মানুষ, পড়ে আছে নোংরা শুকনো মাংসের দলার মত। প্রকৃতি এর সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, কি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা!

কিন্তু সব কি নিতে পেরেছে? আমি ভদ্রমহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। কি সুন্দর চোখ! শুধু পৃথিবীর নয়, অনন্ত নক্ষত্রবীথির সমগ্র সৌন্দর্য এই দু'চোখে ছায়া ফেলেছে। এত সুন্দর চোখ কোন মানবীর হতে পারে না।

আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললাম, রানু আপা, কেমন আছেন?

ভদ্রমহিলা একটু চমকালেন। তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। তিনি হাসলেন। তাঁর সেই হাসি মুখে ধরা পড়ল না, চোখে ধরা পড়ল। ঝিকমিক করে উঠল চোখ।

আমি বললাম, রানু আপা, আপনার চোখ এত সুন্দর কেন বলুন তো? এত সুন্দর চোখ মানুষের থাকা উচিত না। এটা অন্যায়।

ভদ্রমহিলা বালিশের নিচ থেকে হাতড়ে হাতড়ে নোটবই বের করলেন। পেনসিল বের করলেন। অনেক সময় নিয়ে কি যেন লিখলেন। বাড়িয়ে দিলেন সেই লেখা। অস্পষ্ট হাতের লেখায় তিনি লিখেছেন —

'কেমন আছ ভাই?'

আমি বললাম, আমি ভাল আছি। আপনিও কিন্তু ভাল আছেন। আমি আপনার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। শারিরীক কষ্ট আপনি জয় করেছেন।

তিনি আবার নোটবই হাতে নিলেন। আমি বললাম, আপা, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি চাচ্ছেন আপনি যেন আপনার

কপালে হাত রেখে একটু প্রার্থনা করি। কি ঠিক বললাম না? আমি আপনার কপালে হাত রাখছি — প্রার্থনা কিন্তু করব না আপা। প্রার্থনা আপনার প্রয়োজন নেই।

তার চোখ ভিজে উঠল। বাঁ চোখ থেকে এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে গিয়েও পড়ছে না। দীর্ঘ আঁখিপল্লবের কোণায় মুক্তার মত জমে আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই মহিলার চোখের ভাষা আমি সত্যি সত্যি পড়তে পারছি। ঈশ্বর তাঁর মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন চোখে।

ভদ্রমহিলার চোখ খুব সুন্দর করে আমাকে বলল, ভাই, আমি সারাক্ষণ একা থাকি। এইটাই আমার কষ্ট, অন্য কোন কষ্ট নেই। তুমি কি জান আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেও কি আমাকে একা থাকতে হবে ?

আমি নিচু গলায় বললাম, আপা, আমি জানি না। আমি আসলে কিছুই জানি না। জানার জন্যে এর কাছে তার কাছে যাই — তারাও জানে না। আপনি যদি কিছু জানেন আমাকে জানিয়ে যান।

তিনি হাসলেন। তাঁর চোখ ঝিকমিক করে উঠল। ওসি সাহেব বললেন, হিমু ভাই, আসুন আমরা যাই। ওসি সাহেবের চোখ ভেজা। কিন্তু গলার স্বর স্বাভাবিক।

হাসপাতালের বাইরে এসে আমি বললাম, আপনি কি অপনার স্ত্রীর চোখের ভাষা পড়তে পারেন?

'আগে পারতাম না, কিছুদিন হল পারছি। আগে ভাবতাম মনের ভুল, উইসফুল থিংকিং। এখন বুঝছি মনের ভুল নয়। চোখ দিয়ে মানুষ আসলেই কথা বলতে পারে। হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। আমাকে বদলি করা হয়েছে চিটাগাং হিলট্রেক্টে। আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছি। ও মারা যাবার পরপরই চলে যাব। যদি কোনদিন পাহাড় জঙ্গল দেখতে ইচ্ছে করে আসবেন আমার কাছে।'

'আমার মনে থাকবে।'

'আপনার কাগজপত্র সব তৈরি করে এনেছি। আপনি নাম সই করে আমার কাছে দিন, আমি জমা দিয়ে দেব। তবে আমার মনে হচ্ছে লাভ হবে না।'

'চেষ্টা করে দেখি।'

'দেখুন, চেষ্টা করে দেখুন। কিছু হবে না জেনেও তো আমরা চেষ্টা করি।'

'আপনি কি আবার হাসপাতালে যাবেন?'

'জ্বি-না। বাসায় চলে যাব। দুটা ছোট ছোট বাচ্চা বাসায়। পুলিশের ছেলেমেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ওরা অসম্ভব ভীতু।'

'তারা মা'কে দেখতে আসতে চায় না?'

'চায়। আমি আনি না। আপনার কি মনে হয় আনা উচিত?'

'ওদের যদি আসতে ইচ্ছা করে অবশ্যই আনা উচিত। চলুন ওসি সাহেব, কোন একটা রেস্টুরেন্টে বসে এক কাপ চা খাই। চলুন।'

কিছুদূর এগুতেই রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল। চা খাওয়া হল নিঃশব্দে। আমি কাগজপত্র সই করে দিলাম। বেশ কয়েকটা দরখাস্ত। একটি পাবলিক প্রসিকিউটারের কাছে, একটা ডিআইজি প্রিজনের কাছে, একটা মোবারক সাহেবের উকিলের কাছে।

তিনি কাগজপত্র ব্যাগে রাখতে রাখতে বললেন, হিমু সাহেব, আজ উঠি।

আমি বললাম, চলুন আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

'এগিয়ে দিতে হবে না। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।'

তিনি দ্রুত পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দরখাস্তে কোন লাভ হল না। অনুমতি পাওয়া গেল না।

জেলখানা, পুলিশ, কোর্ট–কাছারি এইসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন আমার ছোট মামা। ছোট মামাকে চিঠি লিখলাম। চিঠি পাঠাবার তৃতীয় দিনের দিন তিনি চলে এলেন। আসবেন তা জানতাম। আমার প্রতি মামাদের ভালবাসা সীমাহীন।

একটা হ্যাণ্ডব্যাগ, একটা ছাতা, বগলে ভাজ করা কম্বল নিয়ে রাতদুপুরে মামা উপস্থিত। এমনভাবে দরজা ধাক্কাচ্ছেন যেন ভেঙ্গে ফেলবেন। মেসের অর্ধেক লোক জেগে গেল। আমি হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুললাম। ছোট মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, বিষয় কি রে, আমি খুবই চিন্তাগ্রস্ত। বাড়িতে বিরাট যন্ত্রণা — না বললে বুঝবি না। তারপরে ও চিঠি পেয়ে স্থির থাকতে পারলাম না। শরীর ভাল?

'জ্বি ভাল।'

'কই, কদমবুসি তো করলি না।'

আমি কদমবুসি করলাম। মামা খুশি খুশি গলায় বললেন, থাক থাক, লাগবে না। আল্লাহ বাঁচায়ে রাখুক। তোর গায়ের রঙটা ময়লা হয়ে গেছে। রোদে ঘোরাঘুরি এখনও ছাড়লি না।

'হাত–মুখ ধোন, মামা।'

'হাত–মুখ আর ধোব না। একবারে গোসল করে ফেলব। ঘরে জায়নামাজ আছে? নামাজ ক্বাজা হয়ে গেছে। ক্বাজা আদায় করতে হবে। নামাজ শেষ করে তোর বিষয় কি শুনব। ঝামেলা বাঁধিয়েছিস?

'হুঁ।'

'পুলিশী ঝামেলা?'

'হু।'

মামার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল। হাসিমুখে বললেন, কোন চিন্তা করিস না। পুলিশ কোন ব্যাপারই না। আমরা তো বেঁচে আছি, এখনো মরি নাই। তোর চিঠি পড়েই বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। চিঠি পেলাম একটায়, চারটায় গাড়ি ধরলাম। তোর মামি চিল্লাচিল্লি করতেছিল — দিলাম ধমক। মেয়ে ছেলে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে না। তাকে বললাম, অবস্থা সিরিয়াস না হলে হিমু চিঠি লেখে? সেকি চিঠি লেখার লোক?

মামা গোসল করে জায়নামাজে বসে গেলেন। দীর্ঘ সময় লাগলো নামাজ শেষ করতে। তাঁর চেহারা হয়েছে সুফি সাধকের মত। ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ি। মোনাজাত করবার সময় টপটপ করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। আমি অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখলাম।

'তারপর বল, কি ব্যাপার?'

'একজন লোক জেলখানায় আছে মামা। ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার দেখা করার কায়দা পাচ্ছি না। দরখাস্ত করেছি, লাভ হয়নি।'

'খুনের আসামী? তিনশ' বার ধারা?'

'কোন ধারা তা জানি না তবে খুনের আসামী।'

'এটা কোন ব্যাপারই না। টাকা খাওয়াতে হবে। এই দেশে এমন কোন জিনিস নাই যা টাকায় হয় না।'

'টাকা তো মামা আমার নেই।'

'টাকার চিন্তা তোকে করতে বলছি না–কি? আমরা আছি কি জন্যে? মরে তো যাই নাই। টাকা সাথে নিয়ে আসছি। দরকার হলে জমি বেচে দিব। খুনের মামলাটা কি রকম বল্ শুনি। আসামী ছাড়ায়ে আনতে হবে?

'তুমি পারবে না মামা। তোমার ক্ষমতার বাইরে।'

'আগে বল, তারপর বুঝব পারব কি পারব না। টাকা থাকলে এই দেশে খুন কোন ব্যাপারই না। এক লাখ টাকা থাকলে দু'টা খুন করা যায়। প্রতি খুনে খরচ হয় পঞ্চাশ হাজার। পলিটিক্যাল লোক হলে কিছু বেশি লাগে।

আমি মোবারক হোসেন সাহেবের ব্যাপারটা বললাম। মামা গালে হাত দিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। সব শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পুলিশের সাজানো মামলা — পেছনে আছে বড় খুঁটি। কিছু করা যাবে না। ট্রাইব্যুনাল করলে কোন আশা নই। সিভিল কোর্ট হলে আশা আছে। জাজ সাহেবদের টাকা খাওয়াতে হবে। আগে জাজ সাহেবেরা টাকা খেত না। এখন খায়। অনেক জাজ দেখেছি কাতলা মাছের মত হা করে থাকে। কেইস সিভিল কোর্টে উঠলে আমারে খবর দিয়ে নিয়ে আসবি।

'তুমি কি করবে?'

'সাক্ষী যে কয়টা আছে সবার মনে একটা ভয় ঢুকায়ে দিতে হবে। বলতে হবে সাক্ষী হয়েছে কি জান শেষ। এই সব কথা এরা বিশ্বাস করবে না। তখন একটাকে মেরে ফেলতে হবে। একটা শেষ হয়ে গেলেই বাকীগুলো ভয় পেয়ে যাবে। এছাড়াও আরো ব্যাপার আছে। তুই ছেলেমানুষ বুঝবি না। তুই আমারে খবর দিস, চলে আসব।'

'মামলা মোকদ্দমা তোমার খুবই ভাল লাগে?'

'এইসব ভাল লাগার ব্যাপার? তুই একটা ঝামেলায় পড়েছিস . . .

'আমি কোন ঝামেলায় পড়িনি মামা।'

'তোর চেনাজানা একজন পড়েছে। ব্যাপার একই। ভাই বেরাদর, বন্ধু এদের না দেখলে দেখব কাকে? পাড়ার লোককে দেখব?

'মামা কিছু খাবেন? হোটেল সারারাত খোলা থাকে। চলুন যাই।'

'না কিছু খাব না।

ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাব।' এতক্ষণ জেগে থাকবেন?

'কোরান তেলাওয়াত করব, তুই ঘুমা।'

মামা ফজরের নামাজ পড়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলেন। ভোরবেলা জেগে উঠে দেখি মামা নেই। সারাদিন অপেক্ষা করলাম। তিনি ফিরলেন ঠিক সন্ধ্যায়। আমার সঙ্গে একটি কথাও না বলে মাগরেবের নামাজ শেষ করে আমাকে ডাকলেন। খুশি খুশি গলায় বললেন, ব্যবস্থা করে এসেছি। কাল সকাল দশটায় জেলগেটে চলে যাবি। আর শোন হিমু, আমি আর থাকতে পারব না। বাড়িতে বিরাট যন্ত্রণা রেখে এসেছি। কেলেংকারী অবস্থা। গিয়ে সামাল দিতে হবে। এখানকার মামলা শুরু হোক। তুই খবর দিস। খবর দিলেই চলে আসব। তোর জন্য মনটা সবসময় কাঁদে।

আমি মামাকে রাতের ট্রেনে তুলে দিতে গেলাম। দু'জন প্ল্যাটফরমে দঁড়িয়ে আছি — গার্ড সবুজ বাতি দেখয়ে দিয়েছে, মামা বললেন, তাড়াতাড়ি কদমবুসি করে ফেল। ট্রেন ছেড়ে দিবে।

আমি কদমবুসি করতেই মামা আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। ট্রেন ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। মামা বললেন, থাক, বাদ দে। একদিন তোর সাথে থেকেই যাই। কাল রাতের ট্রেনে গেলেই হবে। আসছি যখন মীরপুরের মাজার শরীফটা জিয়ারত করে যাই। খুব গরম মাজার।

না-মানুষদের অন্তরে ভালবাসা থাকে না এটা ঠিক না। না-মানুষদের অন্তরে ভালবাসা তীব্র ভাবেই থাকে।

মোবারক হোসেন সাহেব আমাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বিস্ময় গোপন

করার কোন চেষ্টা করলেন না। তাঁর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সারা গায়ে পানি এসেছে। হাতে-মুখে পানি এসেছে। ঘনঘন ঢোক গিলছেন।

'হিমু, তুমি দেখা করার ব্যবস্থা করলে কি করে? কাউকেই তো দেখা করতে দিচ্ছে না। তিতলীকেও দেয়নি। অন্যের কথা বাদ দাও।'

আমি বললাম, ব্যবস্থা করেছি। দেখা করা কোন সমস্যা না। আপনার জন্য দু' প্যাকেট সিগারেট এনেছি।'

'থ্যাংকস। মেনি থ্যাংকস। তোমাকে দেখে ভাল লাগছে। ঐদিন তোমাকে আজেবাজে কথা বলেছি। কিছু মনে রেখ না। যদি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই, যদি বের হতে পারি, তোমাকে আমি খুশি করে দেব।'

'আমি এম্নিতেই খুশি। চাচা, আপনি সিগারেট খান। আমি দেখি।'

'তাও জানি। ভাল লাগছে তোমাকে দেখে। এখন মনে হচ্ছে আমি একেবারে একা না। একজন হলেও আছে — যে আমার জন্য খানিকটা হলেও অনুভব করে। তুমি আজ প্রথম আমাকে চাচা বললে, **I am feeling honoured.**'

মোবারক হোসেন সাহবের চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন কেন?

'দুর্বল হয়েছি কারণ নানান ধরনের অন্যায় এই জীবনে করেছি। সৎ মানুষ যদি হতাম দুর্বল হতাম না। আমি সৎ মানুষ না। তোমার ভাষায় আমি হচ্ছি না-মানুষ। তবে এরা যে মামলা সাজিয়েছে তা মিথ্যা মামলা। মিথ্যা বলেই শাস্তি হয়ে যাবে। সত্য মামলার অনেক ফাঁকফোকর থাকে। মিথ্যা মামলায় থাকে না। হিমু!

'জ্বি।'

'তোমার না-কি ইনট্যুইশন প্রবল। তোমার কি মনে হয় ওরা আমাকে ঝুলিয়ে দেবে?'

'আমার ইনট্যুইশন কাজ করছে না।'

'আমারটাও কাজ করছে না। তোমার মত আমার ইনট্যুইশনও প্রবল। কিন্তু এখন কিছু করতে পারছি না। ভাল কথা, তোমাকে এখানে কতক্ষণ থাকতে দেবে?'

'এক ঘন্টা।'

'গুড, ভেরি গুড। কথা বলার মানুষ নেই। ও আচ্ছা, তোমার ঐ বন্ধু— ওর চাকরিটা হয়েছে তো?'

'জানি না। আমি আর খোঁজ নেইনি। ওকে খবর দিয়ে দিয়েছি।'

'যে চাকরির জন্য এত ঝামেলা করলে সেটার শেষ অবস্থা জানলে না?'

'একদিন যাব। খোঁজ নিয়ে আসব।'

'জহিরের কোন খোঁজ নেই, তাই না?'

'জ্বি-না।'

'হিমু।'

'জ্বি।'

'তোমার ইনট্যুইশন কি বলে জহির বেঁচে আছে? আমার কয়েকদিন থেকেই অন্য রকম মনে হচ্ছে। বেঁচে থাকলে এই অবস্থায় সে লুকিয়ে থাকত না। সে তার চিঠিতে আমাকে শয়তান বলেছে। খাঁচায় ঢুকে পড়লে শয়তান আর শয়তান থাকে না। সে তখন চিড়িয়াখানার পশু হয়ে যায়। আমি এখন চিড়িয়াখানার চিড়িয়া।'

'খাঁচা থেকে যদি বের হতে পারেন তখন কি হবেন?'

'বলতে পারছি না। বলা খুব মুশকিল। কোন কিছুই আগেভাগে বলা যায় না।'

মোবারক হোসেন সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। ধরাতে কষ্ট হল। মনে হল তাঁর হাত কাঁপছে।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'আমার মেয়েটার সঙ্গে ইতিমধ্যে কি তোমার দেখা হয়েছে।?'

'না। তারা কোথায় আছে জানি না। আপনার বাড়ি তালাবন্ধ।'

'ও পুরানো ঢাকায় আছে আগামসি লেন। ঠিকানা দিচ্ছি, একবার দেখা করবে।'

'কিছু বলতে হবে?'

'বলবে, ভাল আছি। চিন্তা করতে নিষেধ করতে। মেয়েটা একলা হয়ে গেছে। ওর মাকে চিকিৎসার জন্যে ওর ভাইরা সিঙ্গাপুর নিয়ে গেছে, জান বোধহয়?'

'জানতাম না, এখন জানলাম।'

'এক ঘন্টা কি হয়ে গেছে হিমু?'

'না, এখনো কুড়ি মিনিট আছে।'

'বল কি, এখনো কুড়ি মিনিট? এই কুড়ি মিনিট কি নিয়ে কথা বলা যায় বল তো? আমার আবার আরেক সমস্যা হয়েছে। গলা শুকিয়ে যায়। একটু পরপর ঢোক গিলতে হয়?

'আপনার যদি কথা বলতে ইচ্ছা না হয় তাহলে আমি চলে যাই।'

'আচ্ছা, যাও — আসলেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মোবারক হোসেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন।

ছোট মামার রাতের ট্রেনে যাবার কথা। কাপড় পরে তৈরি হয়েছেন। বেরুতে যাব, হঠাৎ বললেন — আচ্ছা বাদ দে, আরেকটা রাত থেকে যাই। তোর সাথে দেখাই হয় না। একা একা থাকিস, বড় মায়া লাগে।

'বাড়িতে কি সব সমস্যা না-কি আছে।'

'থাকুক সমস্যা। এক রাতে কি আর হবে? তোর সাথে গল্পগুজবই করা হয়

না।'

'বেশ তো মামা, আসুন গল্পগুজব করি।'

'তুই এবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর। একা একা কত দিন থাকবি! অবশ্যি একা থাকায়ও আরাম আছে। তাই বলে সারা জীবন তো একা থাকা যায় না। ঠিক না?'

'জ্বি মামা ঠিক।'

'দেখে শুনে পাত্রী ঠিক করতে হবে। নন মেট্রিক হলে ভাল হয়। এইসব মেয়ে হাতের মুঠার মধ্যে থাকে। যা বলবি শুনবে। পড়াশোনা জানা মেয়ে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করবে। কালো মেয়ে খুঁজে বের করতে হবে। মুখের ছিরি ছাঁদ আছে কিন্তু রং কালো। ফর্সা মেয়েদের মেজাজ থাকে। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কালো মেয়ে দশ চড়েও শব্দ করবে না। মেয়ে দেখব না-কি হিমু?'

'এখন না মামা। চাকরি-বাকরি নেই, খাওয়াবো কি?'

'খাওয়ানোর মালিক আল্লাহপাক। কে খাওয়াবে এইসব নিয়ে চিন্তা করা মহাপাপের সামিল। এই জগতের সমস্ত পশুপাখি, মানুষ, জ্বিন সবার খাওয়ার দায়িত্ব আল্লাহপাক নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। এই ধর — পিপড়া, পিপড়ার কখনো খাওয়ার অভাব হয়? হয় না। আল্লাহপাক তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পিপড়ার মত এত ক্ষুদ্র প্রাণীর খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আর মানুষের থাকবে না? তাই এইসব নিয়ে চিন্তা করিস না।'

'চাকরি-টাকরি হোক। তারপর তোমাকে বলব। মেয়ে দেখতে বেশি দিন তো লাগবে না।'

'কি বলিস বেশিদিন লাগবে না? বিচার বিবেচনা আছে না? হালের গরু আর ঘরের জরু এই দু'জিনিস বিচার বিবেচনা করে আনতে হয়। চাকরি চাকরি করে মাথা খারাপ করিস না — চাকরিতে বরকত নাই। বরকত হল ব্যবসায়। নবীজীও ব্যবসা করতেন। তোকে ব্যবসায় লাগিয়ে দেব।'

'কিসের ব্যবসা?'

'কাপড়ের ব্যবসা। সাহুদের বড় একটা কাপড়ের দোকান আছে আমাদের অঞ্চলে। হারামজাদাকে শক্ত টাইট দিতেছি। এমন টাইট দিতেছি যে জলের দামে দোকান বেচে ইন্ডিয়ায় ভাগা ছাড়া তার গতি নেই। ঐ দোকান তোকে কিনে দিয়ে দেব। দোতলা ঘর আছে। এক তলায় দোকান, দোতলায় তুই বৌ নিয়ে থাকবি। কি রাজি? হাসতেছিস কেন? হাসির কি বললাম?'

'রাস্তায় হাঁটতে যাবে মামা?'

'রাতদুপুরে রাস্তায় হাঁটব কি জন্যে? তোর একেবারে পাগলের স্বভাব হয়ে গেছে। দুপুর রাতে রাস্তায় কে হাঁটে? চোর হাঁটে আর পুলিশ হাঁটে। তুই চোরও না, পুলিশও না। তুই খামাখা হাঁটবি কেন?'

'খানিকক্ষণ রাস্তায় না হাঁটলে আমার ঘুম আসে না মামা। তুমি শুয়ে পড়। আমি খানিকক্ষণ হেঁটে আসি।'

'হাঁটাহাঁটির একমাত্র অষুধ বিবাহ। বিয়ের পর দেখবি হাতি দিয়ে টেনেও তোকে বউয়ের কাছ থেকে সরানো যাবে না। বাহিরমুখী পুরুষ বউ অন্তপ্রাণ হয়, শাস্ত্রকথা . . .।'

পথে নেমেই মনে হল সেতু মেয়েটির সঙ্গে আজ দেখা হবে। সে কিছু টাকা ফেরত দেবার জন্যে পথে পথে ঘুরছে।

অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। দেখা হল না। একটা ষোল–সতেরো বছরের ছেলে এসে একসময় জিজ্ঞেস করল, স্যার কাউরে খুঁজেন? আমি বললাম, না। সে বয়স্কদের মত ভারী গলায় বলল, একটা ভাল জায়গা আছে, যাইবেন?

'না।'

সে তবু পেছন ছাড়ল না। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ঠিক পাশাপাশি না, খানিকটা দূরত্ব রেখে। আমি এক সময় বললাম, আমার সঙ্গে কুড়ি টাকার একটা নোট আছে। তোমার দরকার থাকলে নিতে পার। ধার হিসেবে, পরে ফেরত দিতে হবে।

ছেলেটি ধার নেয়ার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখাল না। তবে এবার আর দূরে দূরে রইল না। কাছে এগিয়ে এল। আমরা দু'জন হাঁটছি। কেউ কাউকে চিনি না।

৯

'আরে হিমু, প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ, এসো এসো।'

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হবার কোন কারণ নেই, কিন্তু বড় ফুপা উচ্ছ্বসিত। তাঁর মুখভর্তি হাসি। আমি শংকিত বোধ করলাম, মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, আজ মাসের এক তারিখ ফুপা।

'অবশ্যই আজ এক তারিখ। তোমার এ্যালাউন্স খামে ভরে রেখেছি। এখন বল কি খাবে? গতবার কফি খেতে চেয়েছিলে, দিতে পারি নি। দিস টাইম আই হ্যাভ কফি। গুড কফি। খাবে?'

'না। একটা কাজে যাচ্ছি।'

'আরাম করে বোস। মনে হচ্ছে অনেকদিন পর তোমাকে দেখছি।'

'আপনাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন?'

'খুশি খুশি লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'খুশির কারণ ঘটেছে। কারণটা বলার আগে তোমার উপর যে এমবারগো ছিল তা উঠিয়ে নেয়া হল। নো এমবারগো। ইচ্ছে করলে তুমি এখন আমার বাড়িতে যেতে পার। এজ এ ম্যাটার অব ফেক্ট আমাদের সঙ্গে বাস করতে পার। এক কাজ কর, আজই আস। সন্ধ্যার পর আস। ডিনার কর আমাদের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে ফুপা, যাব। এখন যাই!'

বড় ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, এমবারগো কি জন্যে উঠিয়ে দেয়া হল জানতে চাচ্ছ না?'

'না।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! সামান্য কৌতূহলও কি বোধ করছ না?'

'এমবারগো নেই। এটাই বড় কথা। কেন নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাচ্ছি না।'

'বোস তো। বলি কি জন্যে এমবারগো বাতিল হয়েছে।'

'সন্ধ্যাবেলা যখন খেতে যাব তখন শুনব।'

'আহা এখনি শোন। তোমার কৌতূহল না থাকতে পারে, আমার বলার আগ্রহের দাম দেবে না? আরাম করে বোস। তোমার পা উঠিয়ে বসার অভ্যাস। পা উঠিয়ে বোস। কফি খাও। এই কফিটা তোমার জন্যেই আনানো। ঐদিন কফি খেতে চাইলে — দিতে পারলাম না।'

আমি বসলাম। আনন্দিত মানুষের মুখের দিকে তাকানোও আনন্দময় ব্যাপার। ফুপাকে দেখে ভাল লাগছে। তাছাড়া ফুপা মুখে যা'ই বলুন, আমাকে বেশ পছন্দ করেন।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'বাদল বলে তোমার নাকি অনেক ক্ষমতা-টমতা আছে। বল দেখি আমি কি জন্যে খুশি?'

'বাদল সম্পর্কে আপনার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়েছে বলেই আপনি খুশি। ও দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। খুব সম্ভব আমেরিকা।'

ফুপা অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হতভম্ব ভাব খানিকটা কাটার পর বিড় বিড় করে বললেন, আসলেই তোমার ক্ষমতা আছে। ইয়েস, ইউ হ্যাভ পাওয়ার। বাদল ভুল বলেনি। আমি ইমপ্রেসড্। থরোলি ইমপ্রেসড্।

ফুপা ঘোর-লাগা চোখে তাকিয়ে আছেন। আমি তাঁর ঘোর অনেকখানি কাটিয়ে দিতে পারি। বাদল বাইরে চলে যাচ্ছে এটা বলার জন্যে কোন ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। আমি অনুমান থেকে বলেছি। যেহেতু ফুপা আমার উপর থেকে এমবারগো তুলে নিচ্ছেন সেহেতু আমি ধরে নিয়েছি বাদলকে নিয়ে তাঁর আর ভয় নেই। আমেরিকা যাত্রার ব্যাপারটাও সহজ অনুমান — বাদলের বড়বোন রিনিকি আছে আমেরিকায়।

সেই ব্যবস্থা করেছে।

'হিমু।'

'জ্বি ফুপা।'

'আমি সত্যি অবাক হয়েছি। সুপারন্যাচারাল পাওয়ার তাহলে মানুষের আছে!'

'তা আছে।'

'ভবিষ্যৎ তুমি কি কিছু কিছু বলতে পার?'

'সবাই খানিকটা পারে।'

'না না, সবাই পারে না। এটা সবার পারার ব্যাপার না। আচ্ছা আমার ভবিষ্যৎ কি বল তো?'

'আপনার ভবিষ্যৎ খুব ভয়াবহ।'

ফুপা হকচকিয়ে গেলেন। চট করে তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, কেন?'

'আপনার জীবন হবে নিঃসঙ্গ। প্রচুর মদ্যপান করবেন। দু'বছরের মাথায় বড় ধরনের স্ট্রোক হবে। যদি বেঁচে যান তাহলেও সমস্যা। ফুপুর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকবে। শেষটায় এমন দাঁড়াবে যে দু'জন থাকবেন দু'বাড়িতে।'

'এসব তুমি কি বলছ?'

'যা ঘটবে তাই বলছি ফুপা।'

'তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থেকে বলছ না অনুমান করছ?'

'আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থেকে বলছি, তবে লজিকও একে সাপোর্ট করবে। মেয়ে কাছে নেই, ছেলেও চলে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ হওয়াটা তো স্বাভাবিক। সামনের বছর রিটায়ার করছেন। কাজেই মেজাজ থাকবে খারাপ। এম্নিতেই আপনি সিগারেট বেশি খান। তার পরিমাণ আরো বাড়বে। নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে মদ্যপানের মাত্রা দেবেন বাড়িয়ে। স্ট্রোক হবে। যতই দিন যাচ্ছে, ফুপুর সঙ্গে ততই আপনার দূরত্ব বাড়ছে। যেহেতু বাড়ি ছাড়াও ঢাকায় আপনার একটি এ্যাপার্টমেন্ট আছে, কাজেই অনুমান করছি শেষের ভয়ংকর দিনগুলিতে দু'জন থাকবেন দু'জায়গায়।'

কফি চলে এসেছে। ফুপা শুকনো মুখে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন। ফুপার মুখের ভাব দেখে আমার মায়াই লাগল। আমি কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, এতটা মন খারাপ করার কিছু নেই ফুপা। আগেভাগে সমস্যা জানা থাকলে সমস্যা এড়ানো যায়।

ফুপা গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি যা বলছ তাই হবে। আমি সমস্যা এড়াতে পারব না। আমার সেই ক্ষমতাই নেই। তুমি তো খবর রাখ না, মদ্যপান তিনগুণ বেরেছে। এখন রোজই খাই। তোমার ফুপুর সঙ্গে বাক্যালাপ সাতদিনের ভেতর দু'দিনই থাকে বন্ধ। তুমি এসো, আজ সন্ধ্যায় কথা বলব।

ফুপার বাড়িতে যাবার আগে আগে পুরানো ঢাকায় গেলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিতলী যে বাড়িতে থাকে সেটা বের করলাম। ভঙ্গুর দশার এক দোতলা বাড়ি। আধঘন্টার মত কড়া নাড়ার পর বুড়ো মত এক লোক বের হয়ে এলেন। আমি তিতলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে তিনি খুবই সন্দেহজনক চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন।

'তিতলী এ বাড়িতে থাকে আপনাকে কে বলল?'

'তার বাবা বলেছেন।'

'তিনি বলবেন কিভাবে? তিনি তো জেলে।'

'ব্যাখ্যা করতে হলে অনেক সময় লাগবে। আপনি তিতলীকে দয়া করে বলুন হিমু এসেছে।'

'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

'এতসব জানার কোন দরকার নেই। আমার নাম বললেই হবে।'

'কি নাম বললেন?'

'হিমু। হিমালয়।'

'দাঁড়ান এইখানে।'

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নেমে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বিরস মুখে বললেন, তিতলী বলেছে দেখা হবে না।

'আপনি কি আমার নাম বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম।'

'গুবলেট পাকাননি তো। একটা বলতে গিয়ে অন্যটা বলেননি তো?'

'বলেছি হিমু দেখা করতে চায়। হিমালয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কেন জানি মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আবার দরজা খুলে বলবেন — অপ্রস্তুত গলায় বলবেন, আপনাকে বসতে বলেছে। ইনট্যুশন কাজ করল না। আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরেও দরজা খুলল না।

ফুপার পুরো বাড়ি অন্ধকার। পোর্চেও আলো নেই। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছি না। গেট খুলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকলাম। মনে হচ্ছে বাড়ি খা খা করছে। কেউ নেই। বারান্দায় পা দিতেই ফুপা বললেন, এসো হিমু, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

'বাড়ি অন্ধকার কেন? '

'বুঝতে পারছি না। সব বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আছে, শুধু এখানেই নেই। কোন মানে হয় বল তো? ইলেট্রিসিয়ানকে খবর দিয়েছিলাম — সে বলল কাট-আউট চুরি হয়ে গেছে। কাট-আউট কোন বাড়িতে চুরি হয়? চোর কাট-আউট দিয়ে কি করবে বল দেখি?'

'কাট-আউট লাগিয়ে দিলেই হয়।'

'এখানে যেসব পাওয়া যায় সেগুলি ফিট করে না। ব্যাংকক থেকে এনেছিলাম। ড্রাইভারকে পাঠিয়েছি খুঁজে দেখতে কোথাও পায় কিনা।'

'বাড়িতে কেউ নেই?'

'তোমার ফুপু নেই। সামান্য একটু আর্গুমেন্ট হয়েছে। স্যুটকেস গুছিয়ে সন্ধ্যাবেলা চলে গেল।'

'গেছেন কোথায়?'

'বলে গেছে হোটেলে গিয়ে উঠবে। যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। ইট ইজ হাই টাইম দ্যাট সামথিং হ্যাজ টু বি ডান। মনে হয় না এই মহিলার সঙ্গে বাস করতে পারব।'

'বাদল বাড়িতে নেই?'

'আছে। ঘরে বসে কি সব যেন করছে। গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।'

'আমি ওর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি ফুপা। অনেক দিন কথা হয় না।'

'যাও। ও, আরেকটা কথা, তোমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছিলাম, সরি, এ্যাবাউট দ্যাট কিছু রান্নাই হয় নি। কাজের মেয়ে দু'জন আছে, ওরা রাঁধতে পারত। তোমার ফুপু তাদের নিষেধ করে দিয়েছে। দু'জনকেই ছুটি দেয়া হয়েছে।'

'এটা কোন সমস্যা না ফুপা। পাউরুটি আছে তো, ঐ খেয়ে নেব।'

'পাউরুটি খেতে হবে না। ড্রাইভারকে বলেছি যা পায় নিয়ে আসতে। বাদলের সঙ্গে কথাবার্তা যা বলার বলে তুমি ছাদে চলে এসো।'

বাদলের ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের সামনে সে পদ্মাসন হয়ে বসে আছে। তার পরণে গেরুয়া চাদর।

'হচ্ছে কি এসব?'

'মনটা স্থিতি করার চেষ্টা করছি। তুমি বলেছিলে না — মন বিক্ষিপ্ত হলে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে মন স্থিতি করা যায়।'

'বলেছিলাম নাকি!'

'কি আশ্চর্য! না বললে আমি জানব কোত্থেকে?'

'মন কি খানিকটা স্থিতি হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না হিমুদা। এসো ঘরে এসো।'

'তোর সাধনায় বিঘ্ন হবে না তো?'

'কি যে তুমি বল।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমি বললাম, কাট–আউট তুই-ই চুরি করেছিস?

বাদল বিস্মিত হয়ে বলল, কি করে বুঝলে? ও আচ্ছা, তুমি তো বুঝবেই। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার না করলে প্রদীপের আলো স্পষ্ট বোঝা যায় না। এইজন্যেই কাট আউট খুলে ড্রয়ারে রেখেছি। ভাল করিনি হিমুদা?

বাদল উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, ঠিকই আছে। শুনলাম তুই আমেরিকা যাচ্ছিস? বাদল হাসল।

'কি পড়বি সেখানে?'

'আমেরিকা গেলে তবে তো পড়ব?'

'যাচ্ছিস না?'

'তুমি পাগল হলে হিমুদা? আমি আমেরিকা যাব কেন?'

'তাহলে যাওয়া হচ্ছে না?'

'অফকোর্স না। এম্নিতে অবশ্যি কাউকে কিছু বলছি না। সবাই ভাবছে আমি যাচ্ছি। কাজেই আমাকে কেউ ঘাঁটাচ্ছে না। যা ইচ্ছা করতে পারছি। হিমুদা, আমি এইখানেই থাকব।'

'ফুপা–ফুপু মনে কষ্ট পাবেন।'

'আমি চলে গেলে আরো কষ্ট পাবেন।'

'তা ঠিক। তবে নিজের জীবন নিয়ে ওতো ভাবতে হবে। বড় হয়ে কি করবি?'

'তুমি যা করছ আমি তাই করব। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। হিমুদা, এখন তুমি আমাকে মন স্থিতি করার কৌশলটা ভালমত শিখিয়ে দাও। প্রদীপটা শুধু কাঁপছে। দরজা জানালা বন্ধ করে দেব। পদ্মাসনটা কি ঠিকমত হয়েছে?'

'সবই ঠিক আছে। দরজা খোলা রাখাই ভাল। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। ফ্যান বন্ধ করে দে।'

'চাদরটা খুলে খালি গা হব?'

'রেশমী কাপড় গায়ে থাকলে ভাল? তোর মটকা পাঞ্জাবি আছে না? ঐ একটা পরে নে।'

'ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে হিমু দা। তুমি না এলে কি যে হত!'

'তুই সাধনা চালিয়ে যা। আমি ফুপার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'না না, তুমি এখানে বস।'

'এখানে বসলে হবে কি করে? তুইতো এখন সাধনা করবি।'

'ও আচ্ছা, তাও তো কথা। আচ্ছা তুমি যাও।'

যা ভেবেছিলাম, তাই। বড় ফুপা পানের যাবতীয় আয়োজন নিয়ে ছাদে বসেছেন। আইসবক্সে বরফ। ঝাল মরিচ মাখানো চিনা বাদাম। তিনি বসে আছেন শীতল পাটিতে। ঠিক বসে নেই — আধশোয়া হয়ে আছেন।

'বস হিমু। তোমার ফুপু চলে যাওয়ায় একদিকে ভাল হয়েছে। ক্যাট ক্যাট করে কথা শুনাবে না। মুখ গম্ভীর করে থাকবে না। পুরো বোতল শেষ করলেও কারো কিছু বলার নেই।

'পুরো বোতল শেষ করবেন?'

'না। শরীরে সহ্য হয় না। পাঁচ পেগের বেশি এখন আর পারি না। এর কম হলে ঘুমের অসুবিধা হয়। বেশি হলে বমি বমি ভাব হয়।'

'আপনি কি নিয়মিতই পাঁচ করে চালাচ্ছেন?'

'কাল একটু বেশি হয়ে গেল। দশ ক্রস করে ফেললাম। তারপর বমি টমি করে কেলেংকারী অবস্থা। তবে কাল ঘুম খুব ভাল হয়েছিল। এক ঘুমে রাত কাবার। এখন বল হিমু তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

ফুপা গ্লাসে লম্বা চুমুক দিতে দিতে বললেন, নেশাটা ঠিকমত ধরুক, তারপর হায়ার ফিলসফি নিয়ে আলাপ করব। মনের তরল অবস্থায় হায়ার ফিলসফি নিয়ে আলাপ করতে ভাল লাগে। আচ্ছা, তুমি কি মওলানা জালালুদ্দিন রুমীর কবিতা পড়েছ?

'না।'

'আমিও পড়ি নি। শুনেছি — উনি মদ্যপান নিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা লিখেছেন। ভাল কাজ করলেও লোকে ভাল কথা বলে না। মদ্যপান তো কোন ভাল কাজ না। এই নিয়েও একটা লোক ভাল কথা বলবে ভাবাই যায় না। পড়ে দেখা দরকার। কি বল হিমু?'

'আপনি দেখি অতি দ্রুত চালিয়ে যাচ্ছেন ফুপা।'

'প্রথম তিনটা অতি দ্রুত খেতে হয়। তারপর স্লো। স্টিডি হয়ে যেতে হয়। এটাই নিয়ম।'

'আজকে আপনি পাঁচের ভেতর থাকবেন, না সীমা অতিক্রম করবেন?'

'তোমার ফুপু নেই। সুযোগ যখন পাওয়া গেছে হা হা হা — সীমা অতিক্রম করার আনন্দ আছে হিমু। আনন্দ আছে বলেই সবাই সীমা অতিক্রম করতে চায়। অবশ্যি আমাদের হলি বুকে সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করা হয়েছে। হা হা হা।'

'আপনি শুধু শুধু হাসছেন ফুপা।'

'শুধু শুধু হাসছি না-কি? যা ভাবছ তা না। এখনো নেশা হয়নি। আনন্দে

হাসছি। তোমার ফুপু বাড়িতে নেই এই জন্যই আনন্দ বোধ হচ্ছে। আই হেট দিস উইম্যান। সারা জীবন হেট করেছি, মুখে কখনো বলিনি। ভদ্রতা করে বলিনি। আজ তোমাকে বললাম।'

আমি তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে অন্ধকারেও ফুপার চোখ চকচক করছে। বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'মাঝে মাঝে ঐ মহিলাকে আমার খুন করে ফেলতে ইচ্ছা করে। আমাকে খুশি করার জন্য সে আবার কখনো কখনো আহ্লাদী ধরনের কথা বলে। আমি মনে মনে বলি, "চুপ হারামজাদী"। কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখাই যেন বড় আনন্দিত।'

'ফুপু কি আপনাকে পছন্দ করেন?'

'কে জানে করে কি-না। হু কেয়ারস? বুঝলে হিমু, আমার জীবনটা আমি নষ্ট করে ফেলেছি। তেইশ বছর এমন একজন মহিলার সঙ্গে কাটালাম যাকে আমি সহ্যই করতে পারি না।'

'ফুপা আর খাবেন না। আপনি ঠিকমত কথা বলতে পারছেন না। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।'

কথা জড়ালে কিছু যায় আসে না। কি বলছি তা বুঝতে পারছ তো? বুঝতে পারলেই হল। একটু সরে বস। হঠাৎ করে বমি-টমি হয়ে যেতে পারে। কি যেন তোমাকে বলছিলাম — কি পরিমাণ ঘৃণা তোমার ফুপুকে করি সেটা ব্যাখ্যা করছিলাম। উদাহরণ দিলে তুমি বুঝবে। উদাহরণ না দিলে বুঝবে না। চার বছর আগের কথা। অফিসে গেছি, রিনকি কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোন করেছে। ডিম ভাজতে গিয়ে না-কি তার মা'র শাড়িতে আগুন লেগে গেছে। সমস্ত শরীর পুড়ে গেছে। খবরটা শুনে এমন একটা আনন্দ হল, তোমাকে কি বলব হিমু। বারবার মনে হত লাগল, আপদ গেছে, আপদ গেছে। বাঁচলাম, বাঁচলাম। ভাগ্যিস মানুষের মনের কথা কেউই বুঝে না। মনের কথা বুঝতে পারলে বিরাট কেলেংকারী হয়ে যেত। মনের কথা বুঝতে পারে না বলে কেউ কিছু বুঝল না। আমি এমন একটা ভাব করলাম যে মনের দুঃখে মারা যাচ্ছি। সারা রাত না ঘুমিয়ে তোমার ফুপুর পাশে বসে থাকি। হা-হা-হা।'

'ফুপা।'

'বল।'

'বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লে কেমন হয়? আপনি যেভাবে মাথা দুলাচ্ছেন তাতে মনে হয় . . . '

'মাতাল হয়ে গেছি বলে ভয় পাচ্ছ? মোটেই না। মাতাল হলে 'ডাবল-ভিসন'

হয়। সব জিনিস দুটা করে দেখা যায়। আমি কিন্তু একটাই হিমু দেখতে পাচ্ছি। ওনলি ওয়ান হিমু। বড় আনন্দ লাগছে। সত্যি কথা বলার আনন্দ।'

'আপনি কিন্তু ফুপা সত্যি কথা বলছেন না?'

'সত্যি বলছি না!'

'এক বিন্দুও না। ফুপুর গা যখন আগুনে পুড়ে গেল তখন আপনি ভয়ংকর মন খারাপ করেছিলেন।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা ছিল অভিনয়। আমি তোমাদের আসাদুজ্জামান নুরের চেয়ে অনেক ভাল অভিনয় জানি। ওই ছাগলা দাড়িকে আমি অভিনয় শেখাতে পারি। হা-হা-হা।'

'আপনি তাহলে জেনে শুনে এমন ভয়ংকর জীবনযাপন করছেন কেন?'

'উপায় নেই বলেই করছি।'

'উপায় যে একেবারে নেই তাই-ই বা বলছেন কেন?'

'উপায়টা কি?'

'এক সকাবেলা ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুবেন। নাশতা খাবেন, চা খাবেন। পরপর দু'কাপ চা, দু'টা সিগারেট। তারপর শিষ দিতে দিতে ঘর থেকে বের হবেন। একটা রিকশা নেবেন। পাঁচ টাকার রিকশা যতদূর য়েতে চায় ততদূর যাবেন। তারপর রিকশা থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করবেন। হাঁটতেই থাকবেন। হাঁটতেই থাকবেন। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্যে থামতে পারেন। কিন্তু কখনোই পেছনের দিকে তাকাবেন না।'

'কতদিন হাঁটব?'

'পাঁচ বছর, দশ বছর, কুড়ি বছর। নির্ভর করে কতদিন আপনি বাঁচবেন তার উপর।'

'হিমু, তুমি আসলেই পাগল। খারাপ ধরনের পাগল। এ ডেনজারাস মেড ম্যান। ডেনজারাস বলছি কারণ তোমার আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।'

'পছন্দ না হবার কোন কারণ নেই ফুপা। এই পৃথিবী, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনটাই স্থির না। সব কিছু প্রচণ্ড গতিময়। ইলেকট্রন ঘুরছে নিউক্লিয়াসের চারদিকে, নিউক্লিয়াস ঘুরছে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে। ছায়াপথ ছুটে ছুটে যাচ্ছে। শুধু মানুষ হাঁটা বন্ধ করে দিয়েছে। এক সময় কিন্তু মানুষও ঘুরে বেড়াতো যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত। পাখিদের দেখুন, তারা মহাসমুদ্র উড়ে পার হয়। শীতের দেশ থেকে আসে গরমের দেশে। আবার উড়ে যায় শীতের দেশে। সারাক্ষণই উড়ছে। সমুদ্রের মাছের ঝাঁকও তাই করে। মানুষেরও তাই করা উচিত।'

'তাই করলে আজকের সভ্যতা, আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি হত।'

'এইসবের প্রয়োজন নেই ফুপা?'

'প্রয়োজন নেই?'

'না — From dust I have come, dust I will be.'

'তুমি পাগল হিমু। পাগল। বদ্ধ উন্মাদ।'

'আমরা সবাই পাগল ফুপা। পৃথিবীটাই একটা ম্যাড হাউস। আমি আজ উঠি, মাথা ধরেছে। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকব।'

'এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসবে।'

'আসুক। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। মাথা ধরলে আমি কিছু মুখে দিতে পারি না।'

ঘরে ফিরলাম অনেক রাতে। বায়েজীদ সাহেব আমার ঘরের সামনের মোড়ায় একা একা বসে আছেন। আমি বললাম, এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছেন, কি ব্যাপার বায়েজীদ সাহেব?

বায়েজীদ সাহেব নরম গলায় বললেন, একটা ভাল খবর ছিল। এত আনন্দ হচ্ছে, আপনাকে খবরটা না দিয়ে ঘুমুতে পারছি না।

'মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?'

'জ্বি। আপনি যেমন বলেছিলেন ঠিক সে রকম ছেলে। চাকরি করে। দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়ায়।'

'খুব ভাল খবর বায়েজীদ সাহেব।'

'আপনার জন্যেই হয়েছে। ছেলের একটা ছবি আছে আমার কাছে। ছবিটা কি একটু দেখবেন?'

'অন্য একদিন দেখব। আজ প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। অবশ্যি ছবি দেখার দরকার নেই। আমি জানি ছেলে সুন্দর। সুন্দর না?'

'রাজপুত্রের মত ছেলে। সব আপনার জন্যেই হয়েছে। সব আপনার জন্যে। আমি জানতাম হবে। যেদিন আপনাকে বলেছি সেদিনই আমি জানি। মেয়েকে চিঠিও লিখলাম।'

বায়েজীদ সাহেব চোখ মুছছেন।

দুঃখে মানুষ কাঁদে, আবার আনন্দেও কাঁদে।

আনন্দে মানুষ হাসে আবার প্রবল দুঃখেও মানুষ হাসে। এখান থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি — আনন্দ এবং দুঃখ আলাদা কিছু না?

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, কিছু ভাবতে পারছি না।

বায়েজীদ সহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি একটু হাওয়া করি।

'আপনাকে কিছু করতে হবে না। দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন। প্লীজ।'

ঘরে কি ঘুমের অষুধ আছে? একগাদা হিপনল খেয়ে শুয়ে থাকব। মাথার যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে চাচ্ছি না।

১০

মাথার যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পেলাম। এই যন্ত্রণা দীর্ঘ দিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। দিন এবং রাত্রির ব্যবধান মুছে গেল। মনে হত সব সময় দিন, সব সময় রাত। মেস থেকে তারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিল। হাসপাতালের ওয়ার্ডটি বিশাল। রুগীরা শুয়ে আছে। আমিও তাদের সঙ্গে শুয়ে আছি। স্থান কাল সম্পর্কেও বিভ্রমের মত হল। এই মনে হয় হাসপাতাল, এই মনে হয় হাসপাতাল নয় স্টীমারের খোলা ডেক। সিটি বাজিয়ে স্টীমার চলছে। আমরা খুব দুলছি।

ক্রমাগতই লোকজন আসছে আমাকে দেখতে। এগুলি মনে হয় বিভ্রম। মস্তিষ্ক কল্পনা করে নিচ্ছে। বড় মামাকে একদিন দেখলাম। তিনি আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বিড় বিড় করে বলছেন — একি সমস্যা বাধালি বল তো ! এই দৃশ্য অবশ্যই বিভ্রম। বড় মামা মারা গেছেন অনেকদিন আগে।

এক গভীর রাতে রূপাকে দেখলাম। সে রাগী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে — কত কষ্ট করে তোমার ঠিকানা বের করেছি তা কি তুমি জান? আমি তোমাকে হাসপাতালে রাখব না, বাড়িতে নিয়ে যাব।

'তোমার বাবা-মা — তাঁরা কি বলবেন?'

'যা বলার বলুক।'

একদিন সেতু এল এক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে। তার মুখ শুকনো। সে লজ্জিত ও বিব্রত। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, আপনার টাকাটা নিয়ে এসেছি। এটা কি বালিশের নিচে রাখব?

'রাখ।'

'আমি যদি খানিকক্ষণ আপনার বিছানার কাছে বসে থাকি তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?'

'না।'

এই সব দৃশ্যের সবই কি কল্পনা? বোঝার কোন উপায় নেই। এক সময় তিতলী এসে উপস্থিত। তার পরণে আকাশী রঙের শাড়ি। হাত ভরতি সবুজ চুড়ি। সে হাতের চুড়ির টুনটুন শব্দ করতে করতে বলল,

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'পারছি। আপনি তিতলী।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'আমি ভাল নেই।'

'তাই তো দেখছি। কি রোগা হয়ে গেছেন! কি হয়েছে আপনার?'

'জানি না কি হয়েছে। সম্ভবত মারা যাচ্ছি। প্রায়ই প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়। ইদানীং এর সঙ্গে জ্বর হচ্ছে।'

'কে দেখছে আপনাকে?'

'সবাই দেখছে। মেসের একজন ঝি — সে তার দেশ থেকে মাথায় মাখার একটা তেল এনে দিয়েছে। ঐটা মাথায় মাখি। মাথায় মাখলে খুব আরাম হয়।'

'আপনার আত্মীয়-স্বজনরা আপনাকে দেখছেন না?'

'দেখছে। সবাই দেখছে। মৃত আত্মীয়স্বজনরাও নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন। আমার বড় মামা তো প্রায়ই রাতে আমার সঙ্গে ঘুমান। ছোট বিছানা, দু'জনের চাপাচাপি হয়। উপায় কি? শুধু বাদল আসছে না। অসুখের সময় ও পাশে থাকলে ভাল লাগতো।'

'ও কোথায়?'

'ও আমেরিকা গিয়েছে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।'

'আমি যদি বিছানায় আপনার পাশে কিছুক্ষণের জন্যে বসি আপনি কি রাগ করবেন?'

'না রাগ করব কেন?'

'আমার বাবারও মাথা ধরার রোগ আছে। মাথার যন্ত্রাণায় উনি যখন ছটফট করতেন আমি হাত বুলিয়ে দিতাম। বাবার ধারণা, আমি হাত বুলালেই বাবার মাথা-ধরা সেরে যেত। আমি কি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

'না।'

'আপনি কি আমার বাবার খবর জানেন?'

'না।'

'স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয়েছে। ফাঁসির আদেশ হয়েছে।'

'আপনার বাবা কি আপিল করেছেন?'

'আপিল করেছেন।'

'আপনি যে খুব শান্ত ভঙ্গিতে ব্যাপারটা গ্রহণ করেছেন তা দেখে আমার ভাল লাগছে।'

'আমার বাবা আমাকে শান্ত থাকতে বলেছেন। আমি শান্ত হয়ে আছি।'

'ভাল। খুব ভাল।'

'আমার ধারণা, আমার বাবা একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ।'

'আপনার ধারণা ঠিক আছে। পৃথিবীতে অশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে কিছু নেই। সব মানুষই শ্রেষ্ঠ।'

'বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি কি যাবেন? আপনার শরীর এত

খারাপ। আমার বলতে লজ্জা লাগছে।'

'আমি যাব। অবশ্যই যাব।'

স্বপ্নদৃশ্যগুলিতেও কিছু কি সত্যি থাকে?

কারণ পুরোপুরি সুস্থ হবার পর শুনলাম — আসলেই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে মোবারক হোসেন সাহেবের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আপিল করেছেন, তাতে লাভ হয়নি। মার্সি পিটিশন করেছেন। তার ফলাফল এখনো জানা যাচ্ছে না।

একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

মোবারক হোসেন সাহেব খুশি খুশি গলায় বললেন, হিমু কেমন আছ?

'ভাল।'

'শুনেছ নিশ্চয় আমাকে ওরা ঝুলিয়ে দিচ্ছে।'

'শুনেছি।'

'দিনক্ষণ এখনো ঠিক করেনি। কিংবা কে জানে হয়ত ঠিক করেছে, আমাকে কিছু বলছে না। ও, ভাল কথা, পরে আবার জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাব। তোমার বন্ধুর চাকরিটা কি হয়েছে?'

'জানি না। আমি খোঁজ নেইনি।'

'কিছুই জান না ?'

'জ্বি না ।'

'তুমি শুনলে অবাক হবে আমি তোমার ঐ বন্ধুকে একদিন স্বপ্নে দেখলাম? সে আমাকে বলছে — স্যার, একটু দোয়া করবেন আমাদের একটা বাচ্চা হবে। তোমার বন্ধুর সঙ্গে খুব সুন্দর মত একটি মেয়ে। মেয়েটা স্বামীর কথায় খুব লজ্জা পাচ্ছে। আমি তোমার ঐ বন্ধুকে কোনদিন দেখিনি, কিন্তু স্বপ্নে সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললাম।'

মোবারক হোসেন সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, আপনি কেমন আছেন?'

মোবারক হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, বুঝতে পারি না। কিছুই বুঝতে পারি না। হিমু!

'জ্বি।'

'আমার মাথাটা বোধহয় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে — আমাকে যে সেলে রাখা হয়েছে সেখান থেকে একশ' গজ দূরে জেলখানার ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে কয়েদীরা সেই মাঠে ফুটবল খেলে। এক রাতে কি হয়েছে জান? হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালার শিক ধরে মাঠটার দিকে তাকালাম। দেখি কি জান? মাঠটার মাঝখানে একটা গাছ। বেশ বড় একটা গাছ। চারদিক ধু ধু করছে। আর কিছুই নেই। গাছ কোত্থেকে এল বল তো?'

তিনি আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করলেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিচু

গলায় বললেন, তোমাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলার জন্যে ডেকেছিলাম। জরুরী কথাগুলি একটাও এখন মনে পড়ছে না। জহির সম্পর্কে কি যেন বলতে চাচ্ছিলাম মনে করতে পারছি না। জহির তোমার ভাল বন্ধু ছিল, তাই না হিমু?'

'জ্বি।'

'সে ছেলে কেমন ছিল বল তো?'

'সে অসাধারণ একটি ছেলে।'

মোবারক হোসেন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, অতি খারাপ মানুষ হয়েও অসাধারণ একটি ছেলের জন্ম দিয়েছি। এই তো কম কথা না, কি বল?

'তা তো ঠিকই।'

'তুমি এখন চলে যাও হিমু বেশিক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মোবারক হোসেন সাহেব বললেন, তোমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে হিমু। স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবে। রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করবে না।

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমি জেল কর্তৃপক্ষকে বলে রেখেছি ফাঁসির দিন–তারিখ হলে তোমাকে যেন জানানো হয়, যেন তোমাকে এই দৃশ্যটা দেখার অনুমতি দেয়া হয়। তুমি একবার বলেছিলে তোমার খুব শখ এই দৃশ্য দেখার। এরা আমার এই অনুরোধ হয়ত রাখবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি নিচু গলায় বললেন, তোমার জন্যে সামান্য কিছু হলেও করতে পারছি এই জন্যে একটু ভাল লাগছে। তুমি কি চলে যাবার আগে কিছু বলবে? সান্ত্বনার কোন বাণী?

আমি নিচু গলায় বললাম, **Dust we will be.**

'কি বললে?'

'কিছু বলিনি চাচা।'

'আচ্ছা যাও। তোমাকে অনুমতি দিলে চলে এসো, কেমন? আচ্ছা হিমু, আজ কি পূর্ণিমা? তুমি তো আবার চন্দ্র–সূর্যের হিসাব খুব ভাল রাখ।'

'আজ পূর্ণিমা না।'

'শুনেছি এরা ফাঁসি দিনের বেলায় দেয়। ভোরবেলা। ক'দিন ধরে মনে হচ্ছে ওদের যদি বলি — আমার বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম করে যদি রাতে করে তাহলে কেমন হয়। ভরা পূর্ণিমার রাতে। তাহলে কি ব্যাপারটা আরেকটু ইন্টারেস্টিং হবে না?'

'চাচা যাই?'

'আচ্ছা যাও। আমার কথাবার্তায় কিছু মনে করো না। আজকাল কি বলি না বলি তার হিসাব রাখতে পারি না।'

১১

জেল কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়েছি। বিশেষ বিবেচনায় তাঁরা মোবারক হোসেন সাহেবের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। আমাকে আগামীকাল ভোর চারটায় যেতে বলা হয়েছে। ডিআইজি প্রিজন আমাকে একটি পাস দিয়েছেন। এটা দেখালেই জেলখানায় আমাকে ঢুকতে দেবে।

আমি কি যাব দেখতে?

অবশ্যই যাব। আমাকে যেতেই হবে। এই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রকৃতি নিজের হাতে করেছে। একে অগ্রাহ্য করার পথ কোথায়?

কেন জানি মনে হচ্ছে আজ রাতে আমার গাঢ় ঘুম হবে। ঘুমুনো মাত্র ঐ স্বপ্নটা দেখব। দরজার ওপাশ থেকে কেউ আমাকে ফিস ফিস করে ডাকবে হিমু, এই হিমু। ঐ স্বপ্ন আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না। আমি আজ সারারাত জেগে থাকব, হাঁটব পথে পথে। ক'দিন ধরেই রাত দশটার দিকে লোড শেডিং হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এতবড় শহর ডুবে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারে। আজও লোড শেডিং, কিন্তু আকাশ ভেঙে নেমেছে জোছনা। সমস্ত শহর যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জোছনা দেখতে দেখতে আমার হঠাৎ মনে হল, প্রকৃতির কাছে কিছু চাইতে নেই, কারণ প্রকৃতি মানুষের কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখে না।